দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭২ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা।। ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০
৪ ফাল্গুন - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১
website : www.eswastika.com

মহাদেব কেন মহিলাদের আদর্শ পুরুষ

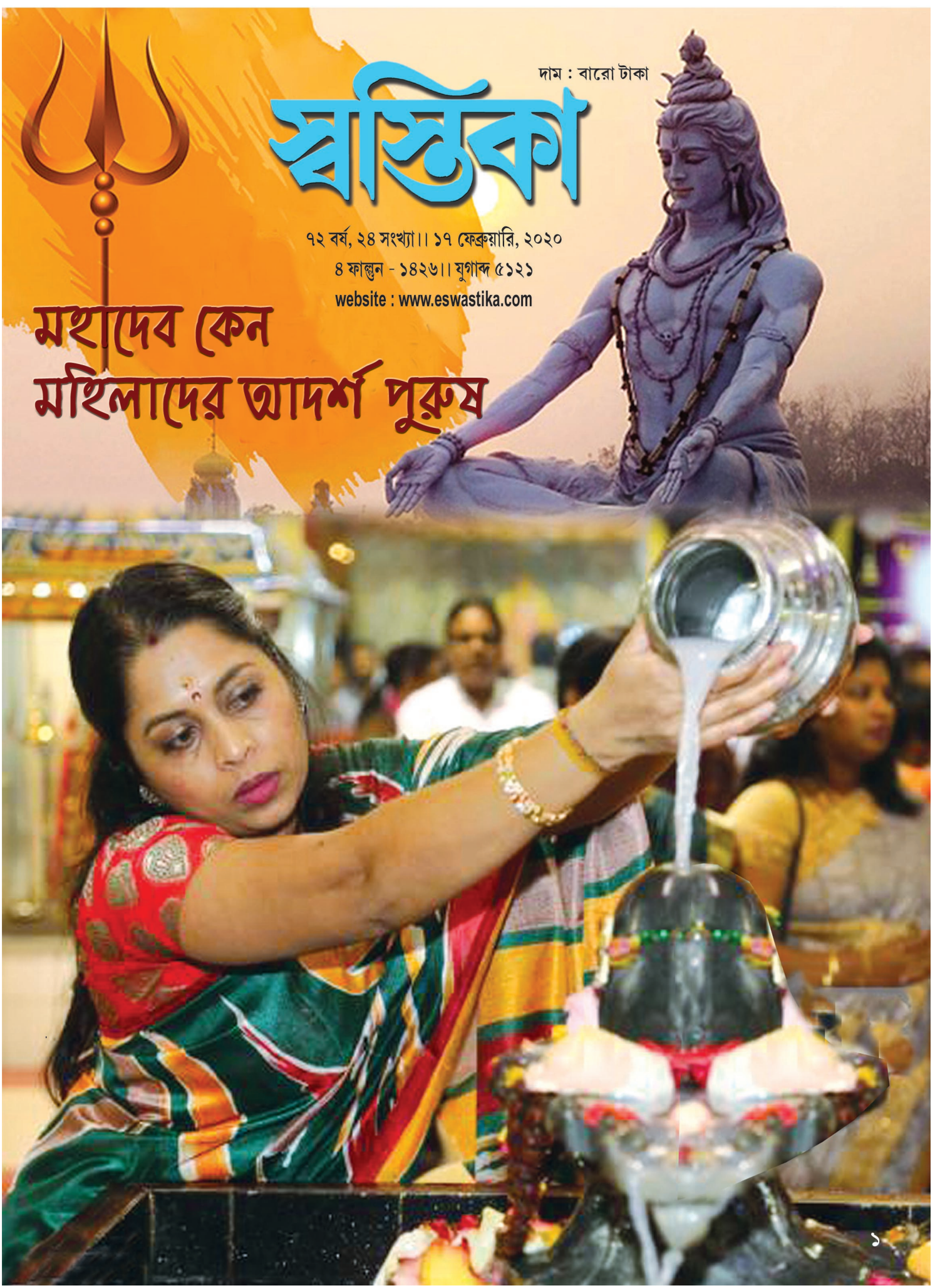

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ২৪ সংখ্যা, ৪ ফাল্গুন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

১৭ ফেব্রুয়ারি - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

লালঝাণ্ডা দুনিয়াকে শুধু রক্তাক্তই করেছে
▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ৬

খোলা চিঠি : দিদির কান্না বাজেট ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

বৃদ্ধির হার বাড়াতে দ্রুত নগরায়ণ আবশ্যিক শর্ত
▯ অরবিন্দ পানাগড়িয়া ▯ ৮

কেন্দ্রীয় আইন ও রাজ্য ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১১

লাভপুরের মাথা হেঁট হতে দেননি তারাশঙ্কর
▯ দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ▯ ১৩

ইম্পিচমেন্ট ট্রায়ালের পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় বহাল
▯ শিতাংশু গুহ ▯ ১৫

কৃষকের উপার্জন দ্বিগুণ করার কয়েকটি উপায়
▯ রাণা ঘোষদস্তিদার ▯ ১৭

মহাদেব কেন মহিলাদের আদর্শ পুরুষ
▯ পারুল মণ্ডল সিংহ ▯ ২৩

শিবক্ষেত্র বারাণসীর মহাশিবরাত্রি উৎসব
▯ অনন্যা চক্রবর্তী ▯ ২৪

জয় শিবশঙ্কর হর ত্রিপুরারি ▯ নিরোদ চন্দ্র শর্মা ▯ ২৬

সার্ধশতবর্ষ অতিক্রম করল উত্তর দিনাজপুরের চূড়ামণ উচ্চ বিদ্যালয় ▯ ড. বৃন্দাবন ঘোষ ▯ ৩১

হিন্দুবীর সম্রাট হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্য
▯ প্রণব দত্ত মজুমদার ▯ ৩৩

গল্প : চোর ও চৌকিদার ▯ গৌতম কুমার মণ্ডল ▯ ৩৫

কিষান রেল যোজনা চাষিকে ঋণমুক্ত করার ক্ষেত্রে বড়ো পদক্ষেপ ▯ অশ্বিনী মহাজন ▯ ৪৩

ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হিন্দুবিদ্বেষ নয়
▯ অভিজিৎ ভট্টাচার্য ▯ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০** ▯ **খেলা :৩৯** ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ▯ **চিত্রকথা : ৪২**▯ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮** ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০

শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মগ্রন্থের প্রতি বারবার আক্রমণ কেন?

বইমেলার শেষদিনে কলকাতা পুলিশ তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনীর ভূমিকা পালন করেছে। এদিন হনুমান চালিশা বিতরণ করার 'অপরাধে' পুলিশ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্টল বন্ধ করে দেয়। এর আগে একদিন একটি বামপন্থী সংগঠনের তরফে গীতায় পা দিয়ে সিএএ এবং এনআরসি-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। বলা বাহুল্য, পুলিশ ছিল দর্শকের ভূমিকায়। রাজনৈতিক প্রতিবাদ করতে গিয়ে হিন্দু ধর্মগ্রন্থকে কেন অবমাননা করা হচ্ছে? হনুমান চালিশা বিতরণ বন্ধ করার সমর্থনে সাম্প্রদায়িক অশান্তির যুক্তি দেখানো হয়েছে। অথচ ওই একই যুক্তিতে বইমেলা প্রাঙ্গণে বাইবেল ও কোরান বিতরণ কেন বন্ধ করা হবে না— এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য নেই। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় সংখ্যায় প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে লিখবেন দেবাশিস লাহা, দেবতনু ভট্টাচার্য প্রমুখ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হিন্দুত্ব রিলিজিয়ন নহে, ধর্ম

সম্প্রতি একটি সভায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী বলিয়াছেন, ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমালোচনা করিতে গিয়া হিন্দুত্বকে আক্রমণ করা অনুচিত। হিন্দুত্বের ব্যাপকতাকে স্মরণে রাখিয়াই ভাইয়াজী যোশী এই কথা বলিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহের এই কথা বলিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কারণ, সম্প্রতি দেখা যাইতেছে বিবিধ প্রসঙ্গে কেন্দ্র সরকার অথবা ভারতীয় জনতা পার্টির সমালোচনা করিতে গিয়া বাম এবং সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলি অকারণে অযৌক্তিকভাবে হিন্দু ভাবনাকে আক্রমণ করিতেছে। সম্প্রতি সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করিতে গিয়াও ইহারা হিন্দুধর্ম এবং দর্শনকে পদদলিত করিয়াছে। ইহা ব্যতীত দীর্ঘদিন ধরিয়াই অকারণে হিন্দুদের আরাধ্য দেব-দেবী সম্বন্ধে অশ্লীল এবং কটূকথা বলা, হিন্দুদের নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠানকে হেয় করা—এইরূপ কর্ম বাম ও সেকুলার রাজনৈতিক পক্ষ করিয়াই আসিতেছে। এই বাম-সেকুলার পক্ষের সমস্যা হইল ভারতীয় জনতা পার্টি এবং হিন্দুত্বকে ইহারা সমার্থক করিয়া ফেলিয়াছে। হিন্দুত্বকে সংকীর্ণ অর্থে দেখিয়াছে, হিন্দু ধর্মের ব্যাপকতাকে তাহারা অনুভব করে নাই। অক্সফোর্ড অভিধানে ধর্ম এবং রিলিজিয়নের দুইটি পৃথক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে, রিলিজিয়ন অর্থে নির্দিষ্ট উপাসনা পদ্ধতি। আর ধর্মের অর্থ হইল একটি জীবন ধারা। এই বিশ্লেষণে যদি হিন্দুত্বকে বিচার করিতে হয়, তবে বলিতেই হইবে হিন্দুত্ব কখনই রিলিজিয়ন নহে, তাহা ধর্ম। ভারতবর্ষের হিন্দুর কোনো নির্দিষ্ট উপাসনা পদ্ধতি নাই। কেহ শাক্ত, কেহ শৈব, কেহ বা বৈষ্ণব—বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতিতে তাহারা অভ্যস্ত। কোনো নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থও হিন্দুর নাই। তাহা হইলে হিন্দুত্বের মূল চালিকাশক্তি কী? হিন্দুত্ব হইল সেই জীবনবোধ, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যাহা উপনিষদের মাধ্যমে ধ্বনিত হইয়াছিল ভারতবর্ষের অন্তরে। এই বোধই কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারী সমগ্র ভারতকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে এতদিন। এই সংস্কৃতিতে লালিত-পালিত যে জাতিগোষ্ঠী—তাহারাই হিন্দু, তাহার উপাসনা পদ্ধতি যাহাই হউক না কেন। হিন্দুত্বের এই ব্যাপক ভাবনায় এই ভারতীয় সংস্কৃতিতে লালিত শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমানরাও তাহাদের ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি থাকিলেও সংস্কৃতিগতভাবে হিন্দু। কংগ্রেস নেতা এবং কেন্দ্রের ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী এম সি চাগলা একদা বলিয়াছিলেন, আমি উপাসনা পদ্ধতিতে ইসলাম অনুসারী হইলেও, সংস্কৃতিগতভাবে হিন্দু। এই হিন্দুত্বভাবনা সনাতন, অর্থাৎ চিরকালীন এবং সর্বজনীন। উপনিষদ হইতে উদ্ভূত এই জীবনভাবনা কখনো সংকীর্ণতার বা বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর কথা বলে নাই। বরং দেশ ও কালের সীমানা ছাড়াইয়া সর্ব দেশের, সর্বকালের মনুষ্যজাতির জন্য এক উন্নত জীবনধারার সন্ধান দিয়াছে।

বাম-সেকুলাররা হিন্দুত্বের সংকীর্ণ ব্যাখ্যাটিতেই আগ্রহ বেশি প্রকাশ করে। হিন্দুত্বকে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে তাহারা জুড়াইয়া দিতে চাহে। কেননা হিন্দুত্বের এই বিকৃত ব্যাখ্যাটি জনসমক্ষে দিতে পারিলে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করিবার তাহাদের যে অভিসন্ধি তাহা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু ইহারা বিস্মৃত হয়, শত শত বৎসর ধরিয়া বহু আক্রমণ সহ্য করিয়াও ভারতের হিন্দু ভাবনা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাহা ধ্বংস হয় নাই। ভবিষ্যতেও হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, এই দেশে কৃষ্ণ বংশী বাজাইবেন, মা কালী পাঁঠা খাইবেন, বৃদ্ধ শিব ষাঁড়ের পিঠে চাপিয়া ডমরু বাজাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবেন। যাহারা ইহা পছন্দ করিবেন না, তাহারা এই দেশ হইতে চলিয়া যাইতে পারেন।

সুভাষিতম্

নির্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।

দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখ-দুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ।। (গীতা ১৫/৫)

যাঁদের মান ও মোহ দূর হয়েছে, যাঁরা আসক্তি জয় করেছেন, যাঁদের পরমাত্মার স্বরূপে নিত্য স্থিতি এবং যাঁদের কামনা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়েছে—সেই সকল সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বমুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি অবিনাশী পরমপদ লাভ করেন।

লাল ঝান্ডা দুনিয়াকে শুধু রক্তাক্ত করেছে

মণীন্দ্রনাথ সাহা

কিছুদিন আগে এক লালনেতা বলেছিলেন, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্লোগান তুলেই রুখতে হবে বিজেপি, আরএস এস-কে।' তিনি আরও অনেক মহতী বাণীও বিতরণ করেছেন। এখন আবার আর এক নেতা বললেন—'দেশকে বাঁচাতে হলে লাল ঝাণ্ডা চাই।' দুনিয়া থেকে এরা বিদায় গ্রহণ করছেন তবু বুলির শেষ নেই।

১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর রাশিয়ার তসখন্দে জেলখাটা মুসলমান কয়েদিদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'। মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখোপাধ্যায়, ইভলিন রায়, রোজা ফিটিনগভ, মহম্মদ আলি, মহম্মদ সফিক এবং এম বি পি টি আচার্যের হাত ধরে এই যাত্রা শুরু। প্রথম সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন মহম্মদ সফিক। তবে সিপিআই এই দিনটি ১৯২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বরকে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু সিপিএম পার্টি গঠন পর্বের ইতিহাসের ধারার তথ্যানুগ অনুসরণ ও বিশ্লেষণ করে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবরকেই প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে মান্যতা দিয়েছে। সেই হিসেবে ১৯২০ থেকে ২০১৯, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের শতবর্ষ হিসেবে পালন করছে সিপিএম।

আমার মনে হয় কমিউনিস্টদের শতবর্ষ প্রতিষ্ঠা দিবসে সিপিমের বক্তাদের মুখ থেকে তাদের দুর্গতির করুণ সুরই বেরিয়ে এসেছে। তরুণদেরকে তারা কোনো পথ দেখাতে পারেননি। শুধু বিজেপি- আরএসএস বিরোধিতা এবং ইনকিলাব বটিকা বিতরণ করা ছাড়া সাধারণ নাগরিকদের আকৃষ্ট করার মতো কোনো কথাও তুলে ধরেননি। আর এসব কারণে সিপিএম নেতাদের কয়েকটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট ব্রিটিশের ঔরসজাত। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কংগ্রেসের শীর্ষ স্থানে আসার পর থেকে কংগ্রেস দেশের স্বার্থ ও ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষায় দোদুল্যমানতায় ভুগেছে। ক্ষমতা হস্তান্তর পর্ব পর্যন্ত কংগ্রেসের বেশিরভাগ স্বার্থসাধক বলে প্রমাণিত হয়েছে। আর কমিউনিস্ট তথা লালরঙা পার্টিগুলির কার্যকলাপ তো জন্মকাল থেকেই দেশের ও জতীয় স্বার্থের ক্ষতি সাধন করে চলেছে। পেছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে এরা বিয়াল্লিশের আন্দোলনে, পঞ্চাশের মন্বন্তরে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের পর চীনের ভারত আক্রমণের সময় এরা দেশদ্রোহীর ভূমিকা পালন করেছে। এই রাজ্যে দীর্ঘ ৩৪ বছর শাসন ক্ষমতায় থাকার সুবাদে মুসলমান সন্ত্রাসবাদী ও পাকিস্তানি হামলাকারীদের ক্রমাগত ধ্বংসাত্মক ও হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপেও সিপিএম দলকে ভারত বিরোধী ভূমিকায় দেখা গেছে। সেই ৩৪ বছরে এরাজ্যে ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্লোগানে ও সরকারি মদতে এবং পার্টির ক্যাডারের হাতে কত যে হিন্দু মরেছে, নারী ধর্ষিতা ও ধর্মান্তরিত হয়েছে, তাদের সংসার ধ্বংস হয়েছে তার হিসেব করা কঠিন। ১৯৬৯ সালে বর্ধমানের সাঁইবাড়ি দিয়ে শুরু করে কাশীপুর বরানগর, মরিচঝাঁপি, বিজনসেতু (আনন্দমার্গী), বানতলা, ধর্মতলা ২১ জুলাই, সূচপুর, ছোটো আঙারিয়া, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, বাসন্তী, নেতাই, দেগঙ্গা প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত মহান কর্মের দৃষ্টান্ত তারা রেখে গেছে তা দেখে বঙ্গবাসী সুযোগ পেয়েই কুলোর বাতাস দিয়ে রাজ্য থেকে কমিউনিস্টদের বিদেয় করেছে। আর দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীরা যখন সেখানে ভারতকে টুকরা করা, কাশ্মীর-মণিপুরের আজাদি দেওয়ার জন্য আল্লার কাছে শপথ নিচ্ছিল, তখন ইয়েচুরি, রাহুল গান্ধী, কেজরিওয়াল সেখানে উপস্থিত থেকে ওই সন্ত্রাসীদের পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন। সেদিনই ভারতের প্রাচীন দুটি জাতীয় রাজনৈতিক দলের নৌকার তক্তায় শেষ পেরেকটা ঠোকা হয়ে গিয়েছে। এখন যতই আপনারা গালভরা শব্দ দিয়ে জনগণকে ভুলানোর চেষ্টা করুন না কেন ভবি ভুলবার নয়। তার প্রমাণ এবারের লোকসভা ভোটেই পেয়ে গিয়েছেন।

অপরদিকে, ১৯২৫ সালের বিজয়া দশমীর দিন নাগপুরে আরএসএস প্রতিষ্ঠা করেন কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। আর ১৯৮০ সালের ৬ এপ্রিল ভারতীয় জনতাপার্টি প্রতিষ্ঠা হয়। সেদিনের ক্ষুদ্র আরএসএস যেমন তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে পত্রপুঞ্জে, ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সমাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে, তেমনি বিজেপিও বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে মান্যতা লাভ করে বিশ্বের এক নম্বর গণতান্ত্রিক দেশ বিশাল ভারতের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। কারণ, এরা কারও সঙ্গে প্রতারণা করেনি।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বারবার আরএসএস-কে আক্রমণ করা এবং বিজেপি বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল, ভারতের ইসলাম প্রেমী তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষী বুদ্ধিজীবীরা একজোট হয়ে অশালীনভাবে এই দুই সংগঠনকে আক্রমণ করেও এদের গতি রুদ্ধ করতে তো পারেইনি বরং নিজেরাই এখন নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। কারণ, এরা দেশের সঙ্গে এবং জনগণের সঙ্গে বারবার প্রতারণা করেছে এবং এখনও করছে।

কমিউনিস্টরা দেশের স্বার্থ না দেখে বরাবর ইসলামের ও রাশিয়ার স্বার্থ বড়ো করে দেখেছে। চীনের জন্য হৃদয়ে চিন্ চিন্ ব্যথা অনুভব করেছে। ভিয়েতনামের জন্য পিতার নাম ভুলেছে কিন্তু দেশের মাটির দিকে তাকায়নি। এই পাপের হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে যতদিন পর্যন্ত এরা ভারতের মাটিতে গড়াগড়ি না দেবে, ভারতমাতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত না করবে, যতদিন পর্যন্ত সাধের ইনকিলাব ত্যাগ করে 'বন্দে মাতরম্' না গাইবে ততদিন পর্যন্ত এদের পাপক্ষয়ের কোনো লক্ষণ দেখা যচ্ছে না বা পাপক্ষয়ও হবে না। ইনকিলাব জিন্দাবাদ কোনো কাজেই লাগবে না। ■

দিদির কান্না বাজেট

একুশে ভোটে। তার আগে শেষ পূর্ণাঙ্গ রাজ্য বাজেটে যেন কল্পতরু হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র যে বাজেট পেশ করলেন তাতে দৃশ্যতই একের পর এক চমকের সমাহার। তার মধ্যে আবার উজ্জ্বল হয়ে রইল— 'হাসির আলো'। যে প্রকল্পের আওতায় বাঙ্গলার ৩৫ লক্ষ গরিব পরিবারকে নাকি তিন মাসে ৭৫ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেবে রাজ্য সরকার। এ জন্য বাজেটে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী।

অমিত মিত্র বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, ''এই প্রকল্পে আমাদের গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের অত্যন্ত গরিব যাঁরা ত্রৈমাসিক ৭৫ ইউনিট অবধি বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন (life line consumer) তাঁদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।''

অর্থমন্ত্রীর এই কথা থেকে অনেকে এই ব্যাখ্যাই করছেন যে, যাঁরা তিন মাসে ৭৫ ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন তাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না।

দিল্লিতে ক্ষমতায় এসেই বিদ্যুৎ মাশুল কমিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তারপর এবার ভোটের আগে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুতের ব্যবহার নিঃশুল্ক করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। শুধু তা নয়, এও সিদ্ধান্ত নেন যে ২০১ থেকে ৪০০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য ৫০ শতাংশ হারে মাশুল নেবে সরকার। বাকি ৫০ শতাংশ সরকার ভরতুকি হিসেবে দেবে।

যদিও অমিত মিত্র এ দিন যে হাসির আলো প্রকল্প ঘোষণা করেছেন তা দিল্লির তুলনায় ধারে ও ভারে দুর্বল। কেজরিওয়াল সরকার মাসে ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারে ছাড় দিয়েছে। রাজ্য বাজেটে বলা হয়েছে তিন মাসে ৭৫ ইউনিট বিদ্যুৎ ফ্রিতে দেওয়া হবে।

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অনেকের মতে, ৭৫ ইউনিট বিদ্যুৎ দেওয়া হোক বা ২০০ ইউনিট— এই অন্ধ পপুলিজম রাজ্যের আর্থিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। সরকারের উচিত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। শিল্প সহায়ক পরিবেশকে উৎসাহ দেওয়া। যাতে মানুষ কাজ পায়, আয় বাড়ে। তখন বিদ্যুতের মাশুল মানুষ মাথা উঁচু করেই দিতে পারবেন।

এটাই ছিল দ্বিতীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। আর সেই বাজেটে রীতিমতো কল্পতরু হতে চাইলেন অমিত-মমতা জুটি। গরিবের হাতে আয় থেকে কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ বিলে সাশ্রয় থেকে চা-বাগানে আবাসন রাজ্য বাজেটে অনেক প্রাপ্তি। অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র ঘোষণা করলেন নতুন ছয় প্রকল্পের। পরে সেই সব প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণও দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেসব শুনে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মানুষ তাঁর দলের সঙ্গে নেই। সেটা বুঝে রাজ্যবাসীকে ঘুস দিতে চাইলেন মমতা। আর সেই সময়েও মিথ্যের ফুলঝুরি ছোটানো হলো বাজেটে।

গত লোকসভা নির্বাচনের ফলই বলে দিয়েছে বাঙ্গলার বড়ো অংশের মানুষ আর তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে নেই। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল ও বনবাসী এলাকায় মানুষের কোনও আস্থাই নেই ঘাসফুলের প্রতি। সেই ক্ষত পূরণ করতেই নামভারী প্রকল্প ঘোষণা করেছে সরকার। সেই সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের পাইয়ে দেওয়ার রাস্তাও খোলা রাখা হয়েছে বাজেটে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার ঘোষিত 'বন্ধু' প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণের বক্তব্য, এটি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের কাছে কাটমানি খাওয়ার প্রকল্প। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পে রাজ্যের ৬০ বছরের বেশি বয়সের তফশিলি জাতির মানুষ, যাঁরা কোনও পেনশন পান না, এরকম ১০০ শতাংশ মানুষকে প্রতি মাসে হাজার টাকা করে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সরকার। এটা একেবারেই ঘুস দেওয়ার প্রকল্প। কিন্তু যাদের ঘুস দিতে চাইছে সরকার তারা তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে দাঁড়াবে কি!

এছাড়াও কর্মসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার যুবক-যুবতীদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার ঘোষণা করেছে রাজ্য। অনেকের মনেই প্রশ্ন, এই ঋণ তো পাবে তৃণমূল কর্মীরা। আর ওই ঋণের পয়সায় গুলি, বন্দুক কেনা হবে না তো যা দিয়ে আগামী পুরভোট ও বিধানসভা নির্বাচনে সন্ত্রাস চলবে রাজ্যে।

তবে সব থেকে বড়ো প্রশ্ন দিদির 'হাসির আলো' প্রকল্প নিয়ে। এখনও তো গরিব মানুষ তাহলে রাজ্যে রয়েছে! ৩৫ লাখ পরিবার মাসে ২৫ ইউনিট বিদ্যুৎও ব্যবহার করতে পারে না! এটাই তো বাঙ্গলার জন্য লজ্জার। হাসির আলো তো আসলে কান্নার আঁধার।

—সুন্দর মৌলিক

বৃদ্ধির হার বাড়াতে দ্রুত নগরায়ণ আবশ্যিক শর্ত

অতিথি কলম

অরবিন্দ পানাগড়িয়া

বিশ্বের যে সমস্ত অর্থনীতি কয়েক দশক ধরে ৮ থেকে ১০ শতাংশ বৃদ্ধির হার টানা ধরে রাখার নজির রেখেছে এমন সব ক্ষেত্রেই অত্যন্ত দ্রুত নগরীকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৯৬৬ সালে শহরে জনসংখ্যার হার ছিল ২৮.৮ শতাংশ, ১৯৯৫ সালে সেই হার পৌঁছয় ৮৫.৭ শতাংশে। আবার চীনে ১৯৮১ সালের ১১ শতাংশ হার ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫১.৩ শতাংশে। লক্ষ্য করার বিষয়, এই সময়সীমায় দুটি দেশই নিম্ন আয়ের দেশ থেকে 'উচ্চ-মধ্য আয়ের' দেশের মানদণ্ড ছুঁয়ে ফেলে। অত্যন্ত শ্রম নিবিড় উৎপাদন শিল্পের প্রসারই এই দ্রুত হারে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির চালিকাশক্তি। গ্রামাঞ্চল থেকে ব্যাপক হারে কৃষিজীবী শ্রেণীকে ভালো মাইনের বিনিময়ে শহরাঞ্চলে এনে উৎপাদন শিল্পে নিয়োগই এই উন্নয়নের মন্ত্র।

এরই প্রতিতুলনায় ভারতে নগরায়ণ হয়েছে শম্বুক গতিতে। ১৯৫১ সালে ১৭.৩ শতাংশ শহুরে জনসংখ্যার হার ৬০ বছর পর ২০১১ সালে দাঁড়ায় মাত্র ৩১.২ শতাংশে। এই হারকে প্রতি দশকে উন্নয়নের নিরিখে ধরলে দাঁড়ায় দশক প্রতি হার মাত্র ২.৩ শতাংশ। আমাদের শহরের উৎপাদন ব্যবস্থা (কলকারখানা ইত্যাদির বৃদ্ধি) কখনই চীন বা কোরিয়ার মতো গ্রাম থেকে মানুষকে চুম্বকের মতো শহরে টেনে আনতে পারেনি। এমনকী ২০০১-২০১১ অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই রমরমার দশকটিতেও নগরায়ণের হার ছিল মাত্র ৩.৪ শতাংশ।

গ্রাম থেকে ভালো কাজের খোঁজে শহরে আসার লোকের প্রবণতায় অভাবের বিবিধ কারণ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কারণটি যা পক্ষান্তরে এই লেখার মূল উপজীব্য তা হলো শহরে এসে সামর্থ্যের মধ্যে বসবাস করার মতো ভদ্রস্থ মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের অভাব। এটা খুবই সহজবোধ্য যে যখন গ্রাম থেকে লোক শহরে ভালো মাইনের কাজ জুটিয়ে থাকার সুযোগ পায় তখনও কিন্তু তারা কম ভাড়ায় থাকার মতো বাসস্থান পায় না। অবশ্যই সেই অঞ্চলটি তার কর্মস্থলের কাছাকাছি হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তুলনামূলকভাবে দূরে হলে rapid transportation-এর ব্যবস্থা থাকা জরুরি।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই ধরনের ভাড়ার বাসস্থান সহজলভ্য নয়। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রকের প্রচলিত নীতি মোতাবেক বর্তমানে যে সমস্ত বাড়ি তৈরি হয়ে বসবাস শুরু হয়ে গেছে তাদের ওপরই কেবল ভরতুকি দেওয়া হয়েছে। ভারতে একমাত্র ব্যতিক্রম রাজস্থান ছাড়া ভাড়া সংক্রান্ত আইন বাড়ির বা ফ্ল্যাটের মালিকদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তৈরি। যে কারণে বহু লোক যারা তাঁদের বাড়তি বাড়িটিতে থাকছেন না তারাও ভাড়া দিয়ে মুশকিলে পড়ার থেকে সেটিকে খালি রাখাই পছন্দ করছেন। এর পরিণতিতে যারা বুক ঠুকে শহরে আসছে বহু ক্ষেত্রেই তাদের শেষাবধি চারদিকে গজিয়ে ওঠা বস্তির বাসিন্দা হয়েই কাটাতে হচ্ছে। অধিকাংশ সুপরিচালিত শহরগুলিতেই বাণিজ্যিকভাবে গড়ে ওঠা ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মিত বাড়িগুলিতেই কর্মসূত্রে শহরে আগত মানুষগুলিতে থাকার ব্যবস্থা থাকে। বলা ভালো আমাদের দেশের শহরগুলিতে এ ধরনের কোনো ব্যবস্থাই নেই। এর কারণ কেবলমাত্র গৃহ ও ভাড়া সংক্রান্ত আইন মালিকের বিপক্ষে রয়েছে তা কিন্তু নয়। যদি আইনে পরিবর্তন এনে বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে এই বৈষম্য দূর করা যায় সেক্ষেত্রেও সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয় না। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভাড়া দেওয়ার মতো বসবাসের বাড়ির তৈরির জন্য জমি জোটানোই দুষ্কর কেননা ভারতে শহর অঞ্চলের জমির বাজার দর প্রকৃত দামের চেয়ে ঢের বেশি। এর সরলার্থ হচ্ছে এই যে, এত চড়া দাম দিয়ে জমি কিনে বাড়ি তৈরির পর সেখানে ভাড়া বসিয়ে যে টাকা আসবে তাতে আয় ও ব্যয়ের হিসেবে ভাসসাম্য থাকবে না। বাণিজ্যিক গৃহ নির্মাতা লোকসানে পড়ে যাবেন। ওই টাকা কেবলমাত্র ব্যাঙ্কে জমা করলেই সুদ বেশি পাওয়া যাবে। মুম্বাইয়ের উদাহরণটা আলোচনা করা যাক। ২০০৬ সালে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভাড়ার আবাসন নির্মাণকারীর Return rate (capital) ছিল ৬ শতাংশ। এর ভাড়া বাবাদ আয়ের শতাংশ হার ২০০৯ সালে নেমে দাঁড়ায় ৩.৫ শতাংশ। ২০১১ সালে কারবার প্রায় লাটে তুলে এই হার দাঁড়িয়েছে ১.৪ শতাংশ। বিনিয়োগের ওপর যদি এই মর্মান্তিক হারে রিটার্ন পাওয়া যায় কোনো পাগল বিনিয়োগকারীই এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ঝুঁকি নেবে না। যদি ভারতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম দিশারি নগরায়ণের গতিকে দ্রুততর করতেই হয় সেক্ষেত্রে শহরগুলিকে নতুন আগন্তুকদের বসবাসের জন্য গ্রহণীয় করতেই হবে। এক্ষেত্রে একান্ত জরুরি শহুরে মালিক-ভাড়াটে আইনে সংস্কার। একই সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্যের উভয়ের তরফেই খুঁজে বের করে শহুরে জমির সরবরাহ বাড়ানো যাতে দাম কমে। এই শেষের ব্যবস্থাটি রূপায়িত করতে গেলে অনেকগুলি ধাপ পেরোতে হবে।

প্রথমত, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের অধীনেই বহু সংস্থা রয়েছে যাদের মালিকানায় বিপুল পরিমাণ জমি আছে। বাস্তবে এই সমস্ত শিল্পদ্যোগগুলির উৎপাদন ব্যবস্থায় সরাসরি ব্যবহৃত জমি পড়ে থাকা উদ্‌বৃত্ত জমির তুলনায় অতি নগণ্য। এই বাড়তি জমি সরকার নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে পারে। একইভাবে বহু সরকারি পরিচালনাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে

অবস্থিত তার সংলগ্ন শত শত একর জমি অব্যবহৃত রয়েছে। বহু ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের বিপুল জমিতে বেআইনি দখলদারদের আটকাতে পারছে না। জমিতে জবরদখল ঘটে যাচ্ছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জমিও অধিগ্রহণ করে বাজারে নিয়ে আসা দরকার। এই সূত্রে উল্লেখ্য, বহু মন্ত্রণালয় বিশেষ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, রেলওয়ে, জাহাজ, নাগরিক বিমান পরিবহণ প্রভৃতি ব্যাপক জমির মালিকানার অধিকারী। যে জমি আদৌ ব্যবহৃত হয় না অকেজো পড়ে থাকে। এগুলিকেও মাঠে নামাতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় শহরগুলিতে floor space index (FSI) যার মাধ্যমে বসবাসের স্থানের স্কোয়ার ফুটের মাপ হিসেব করা হয় তা নির্ধারণ করা হয় মোট ভূমির স্কোয়ার ফুটে মাপ কত (ব্যাপারটা হলো তলায় জমি চওড়ায় অর্থাৎ horizontally কতটা বড়ো) তার ওপরই কততলা বাড়ি হবে তা নির্ভর করবে। যে জমি চওড়ায় যত কম হবে তার ওপর বেশি তল তৈরির অনুমোদন দেওয়া হবে না। এর ফলে এই ধরনের (horizontal) জমির দাম মাত্রাধিক বেড়ে যায় কেননা অনেক ক্ষেত্রেই তা হয়তো সংখ্যায় কম থাকে। অন্যদিকে চাহিদা থাকে বেশি।

অনেকেরই শুনে অবাক লাগবে আজকের চীনের সাংহাই শহরে মানুষের মাথাপিছু স্কোয়ার ফুট জমির পরিমাণ সেখানকার জনসংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও মুম্বাই-এর চেয়ে বেশি। এর কারণ অধিকাংশ বহুতল অল্প জমিতে গগনচুম্বী হয়ে উঠে গেছে। অগণিত ফ্লোর নির্মিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, ভারতীয় শহরগুলিতে অবস্থিত জমির ওপর লাগু থাকা বর্তমান আইনে উদার পরিবর্তন দরকার। জমির এক ধরনের চরিত্র থেকে অন্য চরিত্রে রূপান্তর (conversion) প্রয়োজন। নগরায়ণের ফলে শহরের সংলগ্ন বা উপকণ্ঠের কৃষিজমিকেও বসবাসের জমিতে রূপান্তর জরুরি। যে সমস্ত আইন এই ধরনের পরিবর্তনের বিরোধী সেগুলির বিলোপ দরকার।

চতুর্থত, হিসাববহির্ভূত কর ফাঁকি দেওয়া কালো টাকা রিয়েল অ্যাসেটের ক্ষেত্রে লাগিয়ে রাখাও জমির দাম অস্বাভাবিক বাড়ার অন্যতম কারণ। এই কারণেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চলতি যে সব যুক্তির জন্য গ্রহণীয় সেগুলি ছাড়াও জমির দাম কমিয়ে নগরায়ণের ক্ষেত্রে সুবিধে প্রদানের জন্যও জরুরি।

শেষে, আমাদের জমি অধিগ্রহণ আইনে সংস্কার এনে যাতে জমি দ্রুত সরকার হাতে পায় সেই ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা দরকার। ভারতে প্রচলিত অযৌক্তিক জমির মালিকানা আইনেও পরিবর্তন এনে যাতে মাঝারি ও বড়ো মাপের শিল্পদ্যোগ ও ভাড়ায় বসবাসের গৃহ নির্মাণ সুগম করা যায় তা করা আশু প্রয়োজন। ■

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ

চিকিৎসক সম্মেলন

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের উদ্যোগে আগামী ২৯ মার্চ ২০২০ রবিবার, (সকাল ৮.৩০ থেকে বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত) স্বপ্নপূরণ গোয়াবাগান কমিউনিটি হল, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট, মানিকতলা, কলকাতা-৬, বার্ষিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনে প্রত্যেক হোমিওচিকিৎসক, ছাত্র ও অনুরাগীদের যোগদানের আবেদন জানাই।

শুভেচ্ছাসহ-

ডাঃ সুকুমার মণ্ডল, সভাপতি

যোগাযোগ ঃ

ডাঃ জয়দেব কুণ্ডু : ৯৮৩০৪৪৯১৭২
(কলকাতার জন্য)
ডাঃ ভাস্কর হাজরা : ৯৪৩২৪৬০৪১০
ডাঃ অর্পণ চৌধুরী : ৯৬৪৭৬৫৬২৪৫
ডাঃ রাজীব রায় : ৯৪৭৪৩৬৫৮১৫

প্রতিনিধি শুল্ক : ৩৫০ টাকা

SHYAM TEXTILES LTD.

156A, MAHATMA GANDHI ROAD

KOLKATA - 700 007

রম্যরচনা

কথোপকথন

স্ত্রী : হ্যাঁ গো শুনেছ, স্বর্গে নাকি স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে থাকতে দেয় না!

স্বামী : ডার্লিং সেইজন্যেই তো ওটা স্বর্গ।

* * *

প্রথম বন্ধু : আতঙ্ক কাকে বলে তুই জানিস?

দ্বিতীয় বন্ধু : কাকে রে?

প্রথম বন্ধু : আতঙ্ক কাকে বলে তুই সেই লোকটাকে জিজ্ঞাসা কর যে ছিটকিনি-ভাঙা পাবলিক টয়লেটে বসে আছে।

* * *

স্ত্রী : চুলটা বব করে এলাম। বয়েস অনেক কম লাগছে না?

স্বামী : লাগছেই তো। একদম ন্যাড়া হয়ে এলে না কেন? তা হলে অন্নপ্রাশনের বয়েসের লাগত।

* * *

স্ত্রী : বেশি কথা বলো না, মায়ের কাছে চলে যাব। ওটা আমার বাপের বাড়ি।

স্বামী : তো আমার বাপের বাড়িটা কি মহাভারত যে রোজ কুরুক্ষেত্র বাঁধাও?

উবাচ

“ছত্রধরের (মাহাতো) পিঠে চেপে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চান মুখ্যমন্ত্রী। এই রাজনীতি অত্যন্ত বিপজ্জনক।”

রাহুল সিনহা
বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক

মমতার বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক মাওবাদী সংসর্গের অভিযোগ প্রসঙ্গে

“বাঙ্গলার মানুষ শিক্ষা চায়, শিল্প নয়। কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি চায়। মুখ্যমন্ত্রী যতই বিদ্যুতে ৭৫ শতাংশ ছাড় দিন বা চা-বাগানের শ্রমিকদের আয়কর মকুবের কথা বলুন— পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বোকা বানানো যাবে না।”

দিলীপ ঘোষ
বিজেপির রাজ্য সভাপতি

রাজ্য বাজেট প্রসঙ্গে

“মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগতমান বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। চলতি অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত খরচ করা হয়েছে ৬৩.৫৭ কোটি টাকা।”

রমেশ পোখরিওয়াল
কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী

মাদ্রাসা শিক্ষার বর্তমান হাল প্রসঙ্গে

“অসম প্রাকৃতিক এবং মানবসম্পদে ভরপুর একটি রাজ্য। বরাক, ব্রহ্মপুত্র পাহাড় ও সমতলের মানুষ ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস করলে অসম বিশ্বসভাতেও স্থান করে নিতে পারে।”

সর্বানন্দ সনোয়াল
অসমের মুখ্যমন্ত্রী

অসমের ঐক্যসাধনে বোড়ো চুক্তির গুরুত্ব প্রসঙ্গে

“শাহিনবাগের আন্দোলনকারীরা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের যারা নরেন্দ্র মোদীর ৩৭০ ধারা বাতিল, সুপ্রিমকোর্টের রামমন্দিরের পক্ষে রায়, তিন তালাক বিরোধী আইন ইত্যাদির জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে।”

সুশীল মোদী
বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী

শাহিনবাগে আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মন্তব্য

কেন্দ্রীয় আইন ও রাজ্য

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

এন.আর.সি. ও সি.এ.বি.-র বিরুদ্ধে দেশের বহু জায়গায় বিরাট বিক্ষোভ প্রতিবাদ দেখা দিয়েছে। দুটো বিলই সংসদের উভয় কক্ষে বিপুল গরিষ্ঠতায় গৃহীত হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতি তাতে স্বাক্ষরও দিয়েছেন। তার ফলে এগুলো আইনে পরিণত হয়েছে।

তবে হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্ট রাজ্য ও কেন্দ্রের যে কোনও আইনকে 'unconstitutional' বলে বাতিল করে দিতে পারে কারণ তারাই সংবিধানের ব্যাখ্যাদাতা ও রক্ষাকর্তা।

কিন্তু হাজার হাজার 'সংবিধান বিশেষজ্ঞ' দেশপ্রেমিক প্রতিবাদের নামে 'সংবিধানসম্মত ভাবে' রেল ধ্বংস, বাস পোড়ানো, যাত্রীদের দিকে পাথর ছোঁড়া, বাইক জ্বালানো, রাস্তা অবরোধ ইত্যাদি 'শান্তিপূর্ণ' কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন অনেক জায়গায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নির্বিকারত্ব তাদের এই সব 'বৈধ' কর্মে উৎসাহিত করেছে।

এই প্রসঙ্গে কিছু কথা চলে আসে। কোনো কোনো রাজ্য সরকার জানিয়েছে যে, তারা এই ধরনের আইনকে কিছুতেই মেনে নেবে না এবং কার্যকর হতে দেবে না। সমস্যাটা দেখা দিয়েছে এই ধরনের ঘোষণাকে ঘিরে। প্রশ্নটা হলো— হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট যে কোনও আইনকে খারিজ করে দিতে পারে, কিন্তু রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় আইনকে উপেক্ষা করতে পারে কি?

আমাদের সংবিধানের ১নং অনুচ্ছেদে ভারতকে একটা 'union of states' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই ধরনের কোনও শব্দ নেই। তাতে দুই ধরনের রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে— এককেন্দ্রিক (unitary) ও যুক্তরাষ্ট্রীয় (federal)।

এককেন্দ্রিক দেশে রাজ্য সরকার থাকতে পারে— নাও থাকতে পারে। তবে রাজ্য সরকার থাকলে তাতে কেন্দ্রের অধীনে কাজ করতে হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য সরকার থাকে--- তারও কিন্তু স্রষ্টা সংবিধান। সংবিধান কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে, আর সেই ব্যবস্থাকে রক্ষা করে সুপ্রিম কোর্ট।

আমাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমাদের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের। অবশ্য প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ কে.সি. হুইয়ার (Wheare) এটাকে 'quasi-federal বলে দাবি করেছেন, কারণ এখানে কেন্দ্রীয়করণ করা হয়েছে বেশি করে। সেই থেকে আমাদের দেশের বহু সংবিধান-বিশেষজ্ঞ এই কথাটা ব্যবহার করেন।

তাদের মতে এই সংবিধানে অত্যন্ত বেশি কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে। সুতরাং এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের হলেও আসলে এককেন্দ্রিক। কিন্তু তাঁদের ভ্রান্তি দূর করার জন্য বলা দরকার— কেন্দ্রীকরণ ঘটলেই একটা সংবিধান এককেন্দ্রিক হয়ে যায় না, দেখতে হবে সংবিধানই রাজ্য সরকারকে সৃষ্টি করেছে কিনা, ক্ষমতা বণ্টন করেছে কিনা এবং সেই ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টকে রেখেছে কিনা। কেন্দ্র বা রাজ্য তার গণ্ডী ছাড়িয়ে গিয়েছে দেখলে সুপ্রিম কোর্ট এই ধরনের আইনকে বাতিল করে দিতে পারে। এই ক্ষমতার নাম 'Judicial Review।'

রাজ্য কেন্দ্রীয় নির্দেশ অমান্য করলে কেন্দ্র ধরে নিতে পারে যে, সংবিধান ভঙ্গ করা হয়েছে এবং তার ফলে ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্য সরকারকে বাতিল করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা যায়।

'মডেল ফেডারেশন' আমেরিকা তার যাত্রা শুরু করেছিল রাজ্যকে বেশি ক্ষমতা দিয়ে। কিন্তু গত দুই শত বছরে ব্যবস্থাটা উল্টে গিয়েছে, অথচ এখনও আমরা তাকে 'যুক্তরাষ্ট্র' বলি। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশ এখনও যুক্তরাষ্ট্র অথচ সেই সব দেশেও ঘটেছে বিপুল কেন্দ্রীকরণ। তাহলে তারাও কেন 'quasi-federal' নয়?

ড. জে.সি. জোহারি লিখেছেন, 'Indian federation is horizontal, with a strong unitary bias'--- (ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, পৃ. ৪৩০)। কিন্তু সেটা ঘটেছে সচেতনভাবেই। খসড়া-কমিটির সভাপতি বি. আর. আম্বেদকর বলেছিলেন— 'I want a strong Central।' তার কারণ 'conditions of modern world are such that concentration of power is inevitable।' সত্যিই, যুদ্ধ, যুদ্ধভীতি, অর্থনৈতিক সমস্যা, অভ্যন্তরীণ অনৈক্য, দায়িত্ববোধ ইত্যাদির কারণে কেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে (ড. হুইয়ার— ফেডারেল গভর্নমেন্ট)।

আমাদের সংবিধান সেই বাস্তব কারণেই কেন্দ্রীয়করণের পথ নিয়েছে। আইন প্রণয়ন, শাসন ও আর্থিক দিক থেকে ক্ষমতা বণ্টনের সময় কেন্দ্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তিনটে তালিকা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমে কেন্দ্রীয় তালিকা গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্র তালিকায় রাখা হয়েছে ৯৭টা বিষয়, তাতে পার্লামেন্টই আইন রচনা করে। যুগ্ম তালিকায় ছিল ৪৭টা বিষয়। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই তাতে আইন রচনা করতে পারে। রাজ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোতে রাজ্য সরকারই আইন রচনা করে।

কিন্তু এই তালিকা রচনায় কেন্দ্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, তালিকাগুলোকে কিছু রদবদল করা হয়েছে— তাতে লাভবান হয়েছে কেন্দ্র। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্র তালিকা কেন্দ্রের নিজস্ব—

রাজ্য তাতে ঢুকতে পারে না। তৃতীয়ত, যুগ্ম তালিকা উভয়ের হলেও প্রাধান্য কেন্দ্রেরই— একটা বিষয়ে উভয়েই যদি আইন রচনা করে এবং তাতে অসামঞ্জস্য থাকে, তা হলে কেন্দ্রের আইনই কার্যকর হয়। চতুর্থত, রাজ্য তালিকাতেও কেন্দ্র ২৪৯, ২৫২ ও ২৫৩ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ঢুকতে পারে যদি রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশের গরিষ্ঠতায় এই অনুমতি দেয় বা দুই বা ততোধিক রাজ্য এটা চায় বা রাষ্ট্রপতি-শাসন বলবৎ থাকে— (ড. এম. ভি. পাইলি— (অ্যান্ ইন্ট্রোডাকশান টু দ্য কন্সটিটিউশান অব ইন্ডিয়া, প. ২১৮)। তার মতে, এতে আছে— 'a strong tendency towards a high degree of centralisation।' আরও বড়ো কথা হলো— অলিখিত বিষয়ে আইন রচনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রকে, যদিও আমেরিকা, কানাডা, ইত্যাদি দেশে এটা রাজ্যের বিষয়। আর এটা সুবিদিত যে, এই 'resudiary power' যার থাকে, সেইই হয় শক্তিশালী, কারণ নতুন নতুন বিষয়গুলো তারই। আর রাষ্ট্রপতির হাতে ৩৫২, ৩৫৬ ও ৩৭০নং অনুচ্ছেদ যে জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা দিয়েছে, তাতে কেন্দ্র পেয়েছে 'overiding authority'— (ড. এ.সি. কাপুর— দ্য ইম্পিরিয়াল পলিটিক্যাল সিস্টেম, পৃ. ৩৩৩)। তাই ব্যাপারটা কিন্তু তারই।

সুতরাং বলা চলে, আইন রচনার ক্ষেত্রে ক্ষমতা বণ্টনের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারকেই প্রাধান্য দিয়েছে। এটা পূর্ব-কল্পিত ব্যবস্থা।

আমাদের সংবিধান প্রশাসনিক ক্ষমতাও ভাগ করে দিয়েছে। তবে সেক্ষেত্রেও রয়েছে কেন্দ্রীকরণ। সংবিধান কেন্দ্রকে ক্ষমতা দিয়েছে, to excrsise considerable direction and control over the administrative machinary of the states— (ড. বি.সি. রাউত ডেমোক্র্যাটিক কনস্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ১১৭)। অনুরূপভাবে ড. হরিহর দাস মন্তব্য করেছেন, 'In the administrative system, there is the sub-ordination of the states to the Union-authority'— (প্রিন্সিপল্স্ অব ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশান, পৃ. ১৯৬)। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে—

(১) ২৫৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্য সরকারকে তার ক্ষমতা এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে। The excentive power of every state shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament।'

(২) রাজ্যের কর্তব্য হবে কেন্দ্রের প্রশাসনিক কাজে বাধা না দেওয়া এবং ওই ব্যাপারে কেন্দ্র নির্দেশও দিতে পারে ২৫৭ (১) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।

বড়ো কথা হলো— এই সব ক্ষেত্রে রাজ্য কেন্দ্রীয় নির্দেশ অমান্য করলে কেন্দ্র ধরে নিতে পারে যে, সংবিধান ভঙ্গ করা হয়েছে এবং তার ফলে ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্য সরকারকে বাতিল করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা যায়।

বলা বাহুল্য, যতক্ষণ সংবিধানে ২৫৬ ও ২৫৭ নং অনুচ্ছেদ আছে, রাজ্যে সরকার বলতে পারে না সংশ্লিষ্ট রাজ্যে বিশেষ একটা কেন্দ্রীয় আইন চালু করা যাবে না— এতে চূড়ান্ত বাধা দেওয়া হবে। আসলে, আমরা গ্রহণ করেছি 'co-operative' যুক্তরাষ্ট্র— (ড. জে.সি. জোহারি, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৫৩৭)। তার ভাষায়— 'it seeks co-operation of both the certre and the states in several matters।' কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের নির্দেশও মেনে নিতে বাধ্য অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে। অবশ্যই এভাবে কেন্দ্রকে আইনগত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এটা 'dual polity' হলেও গৃহীত হয়েছে কেন্দ্রীয়করণের নীতি। ড. ভি.ডি. মহাজন মন্তব্য করেছেন, 'Obviously, the federal Government under the constitution has been made very strong'— (দ্য কনস্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২৬৪)।

কিন্তু এর পেছনে আছে কিছু কারণ। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞরা বুঝেছেন যে, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হলেও কেন্দ্রীয়করণের দরকার আছে। তা না হলে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা দেখা দেয়। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের সময় গৃহযুদ্ধও হয়েছিল, সৈন্য নামাতেও হয়েছিল। আর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রগুলো প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয়করণের ব্যবস্থা করেছে। সেই জন্য এখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে— 'with a sub-ordinate position to the states... in favour of the supremacy of the union'— (ড. এস.সি. কাশ্যপ, আওয়ার কন্স্টিটিউশান, পৃ. ২২৩)। ডি. এস. ব্যানার্জিও মনে করেন, এই ব্যবস্থাটা অত্যন্ত বিজ্ঞজনচিত ও ব্যাকরণসম্মত হয়েছে— (সাম অ্যাসপেক্টস অব দ্য কনস্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া)। ■

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

লাভপুরের মাথা হেঁট হতে দেননি তারাশঙ্কর

১৯৩০ সালেই দেশব্যাপী আইন-অমান্য আন্দোলনে লাভপুর অঞ্চলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারাশঙ্কর। সেই অপরাধে কয়েক মাস কারাবাসও করতে হয় তাঁকে।

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতা লাভের সতেরো বছর আগে ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতবর্ষের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম লাভপুরের মাটিতে তুলে ধরা হয়েছিল দেশের জাতীয় পতাকা। পতাকা তুলেছিলেন লাভপুরের এক ভূমিপুত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যিক নন, তিনি তখন স্বাধীনতা-সংগ্রামী এক তরুণ। লাভপুর পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার একটি গ্রাম। বড়ো বিস্ময়ের বিষয় সাধারণতন্ত্র দিবসের কথা যখন দেশের কল্পলোকেও স্বপ্ন জাগায়নি সেই সময় গ্রাম্য তরুণ তারাশঙ্কর দেশের তালে তাল মিলিয়ে তিনরঙা জাতীয় পতাকা তুলে ধরেছিলেন তাঁর নিজের গ্রাম লাভপুরের মাটিতে।

তারাশঙ্করের বিপ্লবী-মনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বাল্যকাল থেকেই। ১৯০৫ সালে রাখিবন্ধন উৎসবের সময় সপ্তমবর্ষীয় তারাশঙ্কর পিতা-মাতার আদর্শে স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হন। মাত্র দশ বছর বয়সে মামাবাড়ি পাটনা গিয়ে কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য একটা বিপ্লবী দল গঠন করেন। গ্রামে ফিরে এসে নিজেদের রক্ত দিয়ে কাগজে লিখে বিপ্লবের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তারাশঙ্করের কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে আলাপ হয়েছিল বিপ্লবী নলিনী বাগচীর সঙ্গে। তিনি তারাশঙ্করের মনে দেশপ্রেমের বহ্নিশিখা জাগিয়ে দিয়েছিলেন। পরাধীন দেশকে বিদেশি শাসনমুক্ত করবার সংকল্প ছিল তাঁর যজ্ঞাগ্নির মতো লেলিহান। সে-বহ্নি ছিল পরম পবিত্র। কয়েকবারই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তারাশঙ্করের। বিপ্লবী দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কারণে ১৯১৬ সালের শেষদিকে এক বছরের জন্য গৃহে অন্তরীণ হন তিনি। অন্তরীণ হওয়ার আগে পর্যন্ত তারাশঙ্করের মনে দেশপ্রেমের আবেগ ছিল— সক্রিয়তা ছিল না। অন্তরীণ হওয়ার সময় থেকে বন্ধন মুক্তির স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য থেকে দেশপ্রেমের আবেগে অগ্নি-সংযোগ করেন। এমন সময় রাশিয়া বিপ্লবের অনুষঙ্গে মার্কসবাদী নেতা লেনিনের আদর্শেও অনুপ্রাণিত হন।

তারপর গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে কংগ্রেস দলে যোগ দেন। তখন থেকেই লাভপুর অঞ্চলের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে গ্রামোন্নয়নের কাজে নিজেকে দেশের কাজে উৎসর্গ করেন তিনি। তিনিই প্রথম তাঁর এলাকায় কংগ্রেসের সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর বাড়িতেই শুরু হয় কংগ্রেস-পার্টির অফিস। কংগ্রেসকর্মী হিসেবে তাঁর বাড়িতে জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতার যাতায়াত ছিল। তাঁদের নিয়ে তারাশঙ্কর গ্রামে মিটিং করার জায়গা পেতেন না। গ্রামের বাইরে অথবা মুসলমান পাড়ায় কবরস্থানে গিয়ে মিটিং করতেন।

১৯৩০ সালের ২ জানুয়ারি, লাহোর কংগ্রেস কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে কার্যনির্বাহক কমিটিতে জাতির সামনে স্বাধীনতার আদর্শ তুলে ধরার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়— সেবারেই অর্থাৎ ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি সমগ্র দেশ জুড়ে পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারেই ভারতবর্ষের গ্রাম থেকে শহরের প্রতিটি অঞ্চলে বিপুল উৎসাহে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। লাহোরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের দিনই গান্ধীজী রচিত এবং কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটি কর্তৃক গৃহীত একটি শপথবাক্য দেশের সর্বত্র পল্লি ও শহরাঞ্চলে পাঠ করা হলো। লক্ষ লক্ষ দেশবাসী দিনটিতে স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করলেন। এই শপথবাক্যে ঘোষণা করা হয়, ''অন্য যে কোনো দেশের মানুষের মতো ভারতবাসীরও অবিচ্ছেদ্য অধিকার রয়েছে স্বাধীনতা লাভের আর যাতে আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ মেলে তার জন্য নিজশ্রমের ফলভোগের ও জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপকরণাদি পাওয়ার— এই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস কোনো সরকার যদি ওই সব অধিকার থেকে কোনো জাতিকে বঞ্চিত করে ও তার উপরে অত্যাচার চালায় তবে সে জাতির অধিকার আছে ওই সরকার পরিবর্তনের, উচ্ছেদ সাধনের। ভারতে ব্রিটিশ সরকার দেশের মানুষকে শুধু তাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেনি, সে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে জনসাধারণের শোষণের উপরে এবং ভারতের সর্বনাশ করেছে

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক দিক থেকেও। আমাদের তাই বিশ্বাস ভারতকে ব্রিটিশের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করে পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে।"

কংগ্রেস স্বাধীনতার এই সংকল্পবাণী রচনা করে প্রতি প্রাদেশিক ভাষায় তার অনুবাদ করে জেলা, মহকুমা ও থানা-স্তরে পাঠিয়ে দেয়। সংবাদপত্রে নির্দেশ দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠান পালনের। এর অর্থ ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। ১৯৩০ সালে এর গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। প্রশাসনিক প্রতিরোধের সম্ভাবনাও ছিল অনেক। বীরভূমে রাজনৈতিক আন্দোলন তখন অনেকখানি পিছিয়ে। রামপুরহাটে জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সিউড়িতে শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং গোপিকাবিলাস সেনগুপ্ত, খয়রাশোলের সুরেন সরকার, বোলপুরে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং হংসবাবু, কীর্ণাহারে অম্বরীশ দাস ও তাঁর ভাই দেবনাথ আর লাভপুরে তারাশঙ্কর ও পার্বতীশঙ্কর দুই ভাই কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী। বীরভূমের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে থেকেও গ্রাম্য তরুণ তারাশঙ্কর সমগ্র দেশব্যাপী স্বাধীনতা উৎসব পালনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর নিজের কথা— ভাবতে ভাবতে আমার বারবার মনে হয়েছে লাভপুরের কথা— ১৯৩০ সনের কথাই বলি। মনে হয়েছিল, সব গ্রামে পতাকা উঠবে, স্বাধীনতার সংকল্প পাঠ করা হবে, শুধু আমার লাভপুরেই হবে না? লজ্জায় মাথা হেঁট হবে লাভপুরের?'

১৯৩০ সালে তারাশঙ্কর লাভপুরের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তা। প্রশাসনিক মহলে ভালো পরিচিত তিনি। তথাপি প্রশাসনিক মহল তারাশঙ্করকে রাজনীতির কাজ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। ২৫ তারিখ সকালবেলা বোলপুর থানার সার্কেল অফিসার তারাশঙ্করকে ডেকে পাঠান— 'জরুরি দরকার, ২৫শে কীর্ণাহার এসে নানুর (চণ্ডীগড়) ডাকবাংলোতে আমার সঙ্গে দেখা করুন। বিশেষ দরকারি। খুব জরুরি'।

নির্দেশ মতো তারাশঙ্কর কীর্ণাহার গিয়ে অফিসারের সঙ্গে দেখা করেন। অফিসার সেদিন তারাশঙ্করকে বলেছিলেন, আপনি এসব আর করবেন না। একবার ছাত্রজীবনে এই পথে পা দিয়ে লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছেন। সেই একই ভুল আর করবেন না। দেশের যে গঠনমূলক কাজ করার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাতে সরকারের তরফ থেকে ভবিষ্যতে আপনি খেতাব, খাতির অনেক কিছু পাবেন। এবার ইউনিয়ন বোর্ডের শ্রেষ্ঠ কাজের জন্য সরকার আপনাকে পুরস্কৃত করবে। সোনার আংটি দেবে। তাছাড়া যে পথে চলতে চাইছেন সে পথে হাঁটলে আপনাকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হবে। আপনার অপরাধে আপনার সন্তানি দাগি হবে। তারা আর সরকারি চাকরি পাবে না ইত্যাদি অনেক কথা। জমিদারেরা বিরোধিতা করেন। কিন্তু নিজের সংকল্পে অবিচল তারাশঙ্করের কাছে লাভপুর তখন 'আমার লাভপুর'। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতবর্ষে প্রথম 'পূর্ণ স্বরাজ' বা স্বাধীনতা ঘোষণার দিন লাভপুরের মাথা হেঁট হতে দেননি তারাশঙ্কর। তিনি তাঁর সেবা সমিতির সদস্যদের নিয়ে পতাকা উত্তোলন করেন এবং স্বাধীনতার শপথবাক্যও পাঠ করেন।

কংগ্রেস তখন নতুন নির্দেশ দিয়েছে ২৬ জানুয়ারি ভোরবেলা উঠে মিছিল বের করে কোনো সাধারণ স্থানে বেদি তৈরি করে সেই বেদির উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবে এবং গ্রহণ করবে পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প। কিন্তু লাভপুরের মাটিতে পতাকা তুলবেন কোথায়? তারাশঙ্কর লিখেছেন—

'১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি জাতীয় পতাকা তুলবার জন্য একটি প্রকাশ্য স্থান খুঁজে পাইনি। জমিদারেরা বাধা দিয়েছে প্রতিটি স্থানে। অবশেষে স্থির করেছি পতাকা তোলা হবে গ্রামের দেবস্থলে, সর্বসাধারণের দেবস্থল, ফুল্লরা মায়ের স্থান সেই ফুল্লরা মায়ের উত্তর দিকে লাভপুর। গণুটিয়া রোডের গায়ে একখানি পতিত জায়গার উপর এই অনুষ্ঠান পালিত হবে।'

২৬ জানুয়ারি একটি ক্ষুদ্র জনতার সামনে স্বাধীন সংকল্পবাণী পাঠ করে জাতীয় পতাকা তুলেছিলেন তারাশঙ্কর। অনেকের মধ্যে স্মরণীয়, কীর্ণাহার থেকে আগত একজন মানুষ পতাকা-রক্ষী স্বেচ্ছাসৈনিক হয়ে পাশে মাথাখাড়া করে দাঁড়িয়ে প্রণতি জানিয়েছিলেন। শীতকালের সারাটি দিন ও রাত্রি পতাকাটি পাহারা দিয়েছিলেন তিনি। পরের দিন পতাকাটি খুলে তারাশঙ্কর তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন— 'তুমি রাখ।' দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর ধরে পরাধীন ভারতের সেই স্বাধীন পতাকাটি বুকে ধরে রেখেছিলেন তিনি। পরে ১৯৬৭ সালের ২৬ জানুয়ারি তারাশঙ্করকে তা ফিরিয়ে দিয়ে বলেন—

'১৯৩০ সালে তোলা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। আমি সেদিন ভলেন্টিয়ার হিসেবে ফ্ল্যাগ পাহারা দিয়েছিলাম। পড়ে গিয়ে আমার হাত কেটে গিয়েছিল। তার রক্ত লেগেছিল এইখানটায়। আপনি আমাকে ফ্ল্যাগটি শিরোপা দিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে আপনি যেদিন কোর্টে স্যারেন্ডার করতে গেলেন, সেদিনও এই ফ্ল্যাগ নিয়ে আপনাকে নারাণবাবুদের ফুল্লরা বাসে তুলে দিয়ে এসেছিলাম।'

কাগজের মোড়ক খুলে বের করেছিলেন— বিবর্ণ হয়ে যাওয়া তিনরক্ষা পতাকাটি। জাতীয় পতাকা কিন্তু অশোকচক্র লাঞ্ছিত নয়, চরকা আঁকা সেই পতাকা। চমকে উঠেছিলেন তারাশঙ্কর— ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারির সেই পতাকা। থরথর করে কেঁপে উঠেছিলেন। পতাকাটি দেখে মোচড় দেওয়া বুক চোখের জলে হাল্কা হয়েছিল। এরপর ১৯৩০ সালেই দেশব্যাপী আইন-অমান্য আন্দোলনে লাভপুর অঞ্চলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারাশঙ্কর। সেই অপরাধে কয়েক মাস কারাবাসও করতে হয় তাঁকে। ■

ইম্পিচমেন্ট ট্রায়ালের পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় বহাল

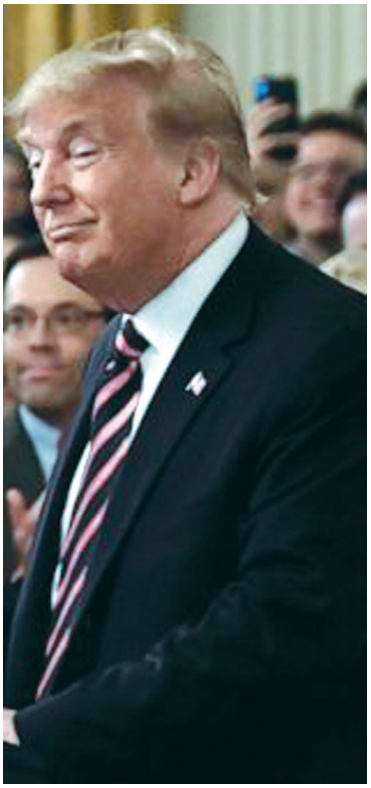

শিতাংশু গুহ

পার্টিজান লাইনে বিভক্ত সিনেট সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইম্পিচমেন্ট ট্রায়াল শেষ করেছে। প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস ঘোষণা করেছেন, প্রেডিডেন্টের বিরুদ্ধে আনীত উভয় অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি, জুরিরা (সিনেটরগণ) প্রেসিডেন্টের পক্ষে মতামত দিয়েছেন বা প্রেসিডেন্টকে অপসারণে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়া যায়নি। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্দোষ, খালাস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বহাল আছেন। প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ, 'ক্ষমতার অপব্যবহার'। এতে ট্রাম্পের পক্ষে ভোট পড়ে ৫২, বিপক্ষে ৪৮। দ্বিতীয় অভিযোগ, 'কংগ্রেসের কাজে বিঘ্নসৃষ্টি'। এতে ভোট পড়ে ৫৩-৪৭। একশো সদস্যের সিনেটে রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের আছে ৫৩টি ভোট। ডেমক্রেটদের ৪৭। প্রথম অভিযোগের ক্ষেত্রে একজন রিপাবলিকান পক্ষ ত্যাগ করে প্রেসিডেন্টের বিপক্ষে ভোট দেন। তিনি হচ্ছেন উত্তহ'র সিনেটর মিট রামনি। দ্বিতীয় অভিযোগের ক্ষেত্রে ভোট হয় পুরোপুরি পার্টি লাইনে।

বিচার শেষ। তবে এ নিয়ে কথাবার্তা চলবে নির্বাচন পর্যন্ত। ভবিষ্যতে আসবে রেফারেন্স হিসেবে। মার্কিন ইতিহাসে তিনজন প্রেসিডেন্ট অভিশংসিত হয়েছেন। এরা হলেন ১৮৬৮ সালে এন্ড্রু ইয়ং; ১৯৯৮ সালে বিল ক্লিনটন এবং ২০১৯-এ ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ পর্যন্ত কোনো প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা হারাননি। রিচার্ড নিসকন কংগ্রেসে ইম্পিচ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করেছেন। এবারকার ইম্পিচমেন্ট প্রক্রিয়া ছিল পুরোপুরি পার্টিজান, যা আগে দেখা যায়নি। এই প্রথম সিনেট সাক্ষী না ডেকেই বিচার কার্য শেষ করে। ট্রাম্প হচ্ছেন প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি অভিশংসিত হয়ে নির্বাচন করছেন। সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে 'ইম্পিচমেন্ট প্রক্রিয়া' শুরুর ঘোষণা দেন। ডিসেম্বরে কংগ্রেস পার্টি লাইনে প্রেসিডেন্টকে অভিশংসিত করে। ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প খালাস পান। ক্ষমতার অপব্যবহার প্রশ্নে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে সিনেটর মিট রামনি বলেছেন, জানি আমার ভোট কাজে লাগবে না, তবে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ইজ গিল্টি'। ভ্যাটার্ন রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম বলেন, রামনি ব্যক্তিগত আক্রোশ কাজে লাগিয়েছেন। জুনিয়র ট্রাম পরে বলেছেন, রামনিকে পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হোক।

সিনেটে ডেমোক্রেট প্রধান কৌঁসুলি কংগ্রেসম্যান অ্যাডাম শিফ শেষ মুহূর্তে তার বক্তব্যে সিনেটরদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন, তাতে দৃশ্যত কোনো কাজ হয়নি। প্রেসিডেন্টের ডিফেন্স অ্যাটর্নিরা বলেছেন, ইম্পিচমেন্ট প্রক্রিয়াকে এতটা নীচে নামানো হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যে কোনো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই ভীতসন্ত্রস্ত থাকবেন। অ্যাটর্নি জে স্যেকুলা ইতিপূর্বে বলেছেন, ইম্পিচমেন্টের মাত্রা এতটা নীচে নামাটা বিপজ্জনক। আলাস্কার রিপাবলিকান সিনেটর লিসা মারকোস্কি, যিনি সাক্ষী ডাকার পক্ষে ভোট দিয়েছেন, তিনি চূড়ান্তভাবে প্রেসিডেন্টের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। টেনেসির রিপাবলিকান সিনেটর ল্যামার আলেকজান্ডার, যিনি এ বছর রিটায়ার করছেন, তিনি বলেছেন, পার্টিলাইনে ইম্পিচমেন্টের কার্যক্রম ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডের চাইতেও বিপজ্জনক। ফ্লোরিডার রিপাবলিকান সিনেটর মার্কো রুবিও বলেছেন যে, তিনি পার্টিলাইনে ইম্পিচমেন্ট প্রক্রিয়ার বিপদ নিয়ে শংকিত। ডেমোক্রেটরা ভাবছেন, এই প্রক্রিয়া দেশকে কোথায় নিয়ে যাবে? অ্যাডাম শিফ যেমন বলেছেন, আমরা আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেছি।

ইরানের জেনারেল কাসেম সুলেমানিকে 'শীর্ষ সন্ত্রাসী' আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, আমেরিকার গায়ে হাত দিলে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। ইরানকে সংঘাতের পথ ছেড়ে শান্তির পথে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'চয়েস ইরানের'।

বোস্টনের ডেমক্রেট সিনেটর, প্রেসিডেন্ট প্রার্থী এলিজাবেথ ওয়ারেন বলেছেন, এই বিচারের পর স্বেচ্ছাচারিতার জন্য আর কোনো জবাবদিহি করার কিছু থাকলো না। বিচার শেষে কিছু রিপাবলিকান বলেছেন, প্রেসিডেন্টের আচরণ হয়তো যথার্থ ছিল না, কিন্তু ইম্পিচমেন্ট ঠিক হয়নি। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি এ নিয়ে ওভাল হাউসে বিবৃতি দেবেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প টানা ১ ঘণ্টা ১৭ মিনিট 'স্টেট অব দি ইউনিয়ন' ভাষণ দেন। নির্বাচনী বছরে যা হয়, ভাষণটি চমৎকার ও আবেদনপূর্ণ। শুরুতে সচারচর প্রেসিডেন্ট মঞ্চে উপবিষ্ট স্পিকার ও ভাইস-প্রেসিডেন্টের সঙ্গে করমর্দন করে থাকেন, ট্রাম্প হ্যান্ডশেক করেননি। প্রথা অনুযায়ী তিনি ভাষণের দুটি হার্ড কপি দু'জনকে দেন। প্রেসিডেন্টের বক্তব্য শেষ হলে দেখা যায় স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি তাকে প্রদত্ত কপিটি দু'ভাগে ছিঁড়ে ফেলেন। ট্রাম্প তার ভাষণে ইম্পিচমেন্ট ভোট নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। বরং তিনি বাই-পার্টি জান কর্মকাণ্ডের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কালো ভোটারদের জন্যে এবারকার ভাষণে যথেষ্ট উপঢৌকন ছিল। রেডিও হোস্ট রাস লিম্বোকে তিনি সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মানে ভূষিত করেন এবং ফার্স্ট লেডিকে দিয়ে মেডেলটি পরিয়ে দেন। আফগানিস্তানে পোস্টেড এক সেনা কর্তকর্তাকে সরাসরি হাউসে এনে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের চমকে দেন! একশো বছর বয়সী বিশ্বযুদ্ধের হিরোকে ব্যাপকভাবে সম্মানিত করেন। ইরানের জেনারেল কাসেম সুলেমানিকে 'শীর্ষ সন্ত্রাসী' আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, আমেরিকার গায়ে হাত দিলে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। ইরানকে সংঘাতের পথ ছেড়ে শান্তির পথে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'চয়েস ইরানের'। 'ইসলামি সন্ত্রাসবাদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করে তিনি আল বাগদাদির মৃত্যুর দৃষ্টান্ত দেন। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির প্রসঙ্গে তাঁর আনীত প্রস্তাব, নাফটা চুক্তি, দক্ষিণের ওয়াল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিমা, ওপিএড, ইমিগ্রেশন সবই ছিল তার ভাষণে।

ট্রাম্পের ভাষণ শেষ, ঠিক এই সময়ে দেখা যায়, তার পেছনে বসা স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি তাকে প্রদত্ত ভাষণের কপিটি দু'ভাগে ছিঁড়ে টেবিলের ওপর রেখে দেন। ভাইস-প্রেসিডেন্ট আড়চোখে তা লক্ষ্য করেন, কিন্তু কোনো কথা বলেননি। প্রেসিডেন্ট তা লক্ষ্য করেননি। এরপর তিনি নেমে বেরিয়ে যান। সাংবাদিকরা পেলোসিকে প্রশ্ন করেন, আপনি ভাষণের কপি ছিঁড়লেন কেন? স্পিকার উত্তরে বলেন, এরচেয়ে ভালো কী করার ছিল? ফক্স নিউজকে তিনি আরও বলেন, পাতার পর পাতা উল্টে কোনো সত্য পাইনি, তাই ছিঁড়েছি। এদিকে ভাষণ ছেঁড়ার ভিডিয়ো বেরিয়ে যেতে একটুও সময় নেয়নি। পুরো অনুষ্ঠানে স্পিকার রাগান্বিত ছিলেন, তা স্পষ্ট, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ভাষণ ছেঁড়ার মধ্য দিয়ে। পুরো আমেরিকা এনিয়ে তোলপাড় হচ্ছে। পক্ষে-বিপক্ষে মন্তব্যের ছড়াছড়ি। সাবেক স্পিকার নিউট জিনরিচ বলেছেন, পেলোসি আমেরিকানদের অপমানিত করেছেন, আমি বিরক্ত, পেলোসিকে সেন্সর করা উচিত। ফক্স নিউজে জন হেনেটি বলেছেন, স্পিকারের পদত্যাগ করা উচিত। স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি'র একজন মুখপাত্র সিএনএনকে বলেছেন, ক'মাস যাবৎ ট্রাম্প-পেলোসি কথা বন্ধ। গত ১৬-অক্টবর সিরিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার নিয়ে এক বৈঠকে ট্রাম্প পেলেসিকে 'থার্ড গ্রেড পলিটিশিয়ান' বলার পর এই ঘটনা। সূত্র বলছে, দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ না থাকাও 'ইম্পিচমেন্টে'র অন্যতম কারণ। অন্যদিকে, গ্যালোপ জরিপের মতে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে, ৪৯ শতাংশ, যা রেকর্ড। শুধুমাত্র রিপাবলিকানদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা ৯৪ শতাংশ। ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স ফক্স নিউজকে বলেছেন, তিনি ভাষণ ছিঁড়েছেন নাকি সংবিধান ছিঁড়েছেন বোঝা যাচ্ছে না। তিনি যোগ দেন, ধারণা করি এই স্পিকার বেশিদিন থাকছেন না?

আইওয়া ককাস, সোমবার ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

রাত পর্যন্ত ৭৫ শতাংশ ভোট গণনায় দেখা যায়, মেয়র পিট্ বুটিগেগ এগিয়ে আছেন; তার ঠিক পেছনে আছেন সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স, তারপর সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন এবং চতুর্থ স্থানে রয়েছেন, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সম্পূর্ণ ফলাফল পরে জানা যাবে। এর আগে ভোট গণনায় সমস্যা দেখা দিলে মেশিনের পরিবর্তে হাতে ভোট গণনা শুরু হয়। স্টেট ডেমক্রেটিক পার্টি চেয়ার ট্রয় প্রাইস দুঃখ প্রকাশ করেছেন। রিপাবলিকান শিবির বলছে, যেই জিতুক ওরা কারচুপি করবে। ফলাফল প্রকাশে বিলম্বের জন্যে ককাস ও জেমক্রেট পার্টির সমালোচনা হচ্ছে।

সোমবার (৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০) আইওয়া ককাস দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ডেমোক্রেট প্রাইমারি শুরু হয়েছে। এরপর মঙ্গলবার ১১ ফেব্রয়ারি নিউ-হ্যাম্পশায়ার প্রাইমারি। পুরো আইওয়া জুড়ে ১৬৭৯ ভোটকেন্দ্রে ভোটাররা ভোট দিয়েছেন। ফলাফল অনেকটা ইলেক্টরাল কলেজ পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। এই ককাসে ৪১ জন ডেলিগেট আছেন। আইওয়া ককাস দিয়ে শুরু বলে হয়তো এর গুরত্ব অনেক, যদিও এখানে যিনি জয়ী হন তিনি পার্টির মনোনয়ন পাবেন তা নাও হতে পারে। ২০১৬-তে সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স আইওয়া ককাস জিতেছিলেন। হিলারি ক্লিন্টন থেকে তিনি প্রায় ৫ শতাংশ বেশি ভোট পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডেমক্রেট মনোনয়ন পান হিলারি।

এদিকে রিপাবলিকান ককাসে আইওয়াতে ট্রাম্প ৯৭.১ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাসাচুটেসের সাবেক গভর্নর বিল ওয়েল্ড; ইলিনয়েসের কংগ্রেসম্যান জো ওয়ালেস ব্যাপক প্রচারণা চালালেও পাত্তা পাননি। ২০১৬-তে ট্রাম্প আইওয়া জিতেছিলেন। তিনি পান ৫১.২ শতাংশ ভোট; হিলারি ৪১.৭ শতাংশ। ১৯৮০ সালে রোনাল্ড রিগানের পর কোনো ডেমক্রেট এভাবে আইওয়া জেতেনি। এবার ৭ জন ডেমোক্রেট প্রার্থী আইওয়া ককাসে অংশ নিয়েছেন, এরা হচ্ছেন, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন; ভারমন্টের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স; বোস্টনের সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন; সাহেব ইন্ডিয়ানার মেয়র পিট্ বুটিগণ; সিনেটর এমি ক্লোবুচার; টম স্টেয়ার এবং এন্ড্রু ইয়াং। আরও ক'জন আছেন, তবে গণনায় নেই? নিউয়র্ক সিটির সাবেক মেয়র মাইক ব্লুমবার্গ অংশ নিতে পারেননি। ▮

কৃষকের উপার্জন দ্বিগুণ করার কয়েকটি উপায়

রাণা ঘোষদস্তিদার

কয়েকবছর আগে এক প্রবন্ধে বাঙ্গলার কৃষিক্ষেত্রে করণীয় কার্যাবলীর মধ্যে কয়েকটি ক্লাস্টারে কাঁঠাল-অরণ্য স্থাপন করার কথা লিখতেই বন্ধুবান্ধবরা আগে খোঁজ নিতে লাগলেন কার মাথায় কে কাঁঠাল ভাঙবে। ইয়ার্কি বটে, তবে নিশ্চিত বলা যায় যে, কৃষিই বাঙ্গলার মুখ্য জীবিকা হতে পারে এই সত্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষিত বাঙ্গালি যেন কৃষিবিমুখ হয়ে থাকবে বলেই জন্মায়। নাহলে কৃষি বা গ্রাম নিয়ে কিছু বলতে গেলেই হাই তুলতে থাকে? এই যেমন আপনারা বেশ কয়েকজন করছেন। খেয়াল রাখবেন, প্রচলিত মত অনুযায়ী কৃষি ও গ্রামকে এই অধম সমার্থক ধরেনি। শহরেও কৃষি সম্ভব, গ্রামে অকৃষি উদ্যোগ। বহুবার বলা, তাও আবার বলা যাক। বলি, যে কল্লোলিনীতে আপনাদের কংক্রিটের স্বর্গ গড়ার শখ, পাট আর চা নামক দুটি কৃষি পণ্য ব্যতীত তার জাঁকজমকের কড়ি জোগাড় হতো কীভাবে বলুন দিকি?

তা সত্ত্বেও, বাঙ্গালি অর্থনীতিবিদ মাত্রেই কতগুলো বাঁধা গতের বুলি আওড়াবেন, আর চায়ের টেবিলে তুফান তুলে কৃষকের আত্মহত্যার সংখ্যা তুলে আপনার দিকে সবজান্তা হাসির ফাঁকে এই আক্ষেপ ছুঁড়ে দেওয়া হবে যে, কৃষিতে লাভ নেই, চাষার ব্যাটা শিক্ষিত হয়েও কেন চাষে আটকে থাকবে। মুখে না বললেও বক্তব্য হলো যে, কৃষকের ছেলে কোনগতিকে বারো ক্লাস টপকে গেলে শহরে এসে সবজির ঠেলা লাগাবে কিংবা সিকিউরিটি গার্ড হবে, আর চাষার মেয়ে এসে বাবুদের সস্তা গার্হস্থ্য কর্মী হবে।

কিন্তু আত্মহত্যার সংখ্যা দিয়ে বিচার করলে তো কৃষি বা গ্রাম ছেড়ে শহরে পলায়ন না করে বরং অফিস-কাছারির শহুরে জীবন ছেড়ে গ্রামের খেতে গিয়ে লাঙল-বলদ নিয়ে সাম্প্রতিক কিকি চ্যালেঞ্জে ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োর মতো নৃত্যপর হয়ে চাষে নেমে যাওয়া উচিত। নয়? কত শতাংশ ভারতীয় কৃষিকর্মে যুক্ত? ষাট শতাংশ তো? বেশ। ২০১৬ সালে কৃষক আত্মহত্যার দুর্ঘটনা ঘটেছিল ১১,৩৭০টি। গড়ে বছরে বারো থেকে তেরো হাজার কৃষক-আত্মহত্যার দুর্ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়, যার মধ্যে সামাজিক কারণবশত আত্মহত্যাকেও ধরে নেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও, ভারতের মোট আত্মহত্যার সংখ্যার মধ্যে কৃষকদের আত্মহত্যা বড়োজোর আট শতাংশ। হ্যাঁ, ২০১৬ সালে মোট আত্মহত্যার সংখ্যা যদি এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার হয়ে থাকে, তাহলে এরকমই হয় হিসাবটা। তাহলে, মোট জনসংখ্যার ষাট শতাংশ যদি আট শতাংশ আত্মহত্যার জন্য দায়ী হয়ে থাকেন, বাকি চল্লিশ শতাংশ বাকি বিরানব্বই শতাংশ আত্মহত্যার শিকার, এর থেকে কি মনে হচ্ছে না অকৃষি জীবিকা আর শহুরে জীবনই যত নষ্টের গোড়া। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে আত্মহত্যার হার উত্তরের তুলনায় দশগুণ, সংখ্যার হারে পদুচেরির ঠিক পরেই কেরলের স্থান। কৃষিকে ভীতিপ্রদ বলে মনে হচ্ছে কি আর? না হলে, এবার শান্তিনিকেতন যখন ঘুরতে যাবেন, তখন সময় করে শ্রীনিকেতনও হয়ে আসবেন। রবির কৃষিভাবনা জানতে একটু কষ্ট হবে। তা, ওঁর গান ছাড়া বাঙ্গালির হাতে যখন কিছু নেই, ওঁর কৃষিভাবনাই বা বাদ যায় কেন?

তাহলে, কৃষির পথ ধরে কীভাবে সমৃদ্ধি আসবে বাঙ্গলার আস্তিনে অবহেলায় লুকিয়ে থাকা চারটি টেক্কার কথা উল্লেখ করে একটু ব্যাখ্যা করি। প্রথমে কাঁঠাল খাওয়া যাক। সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, ইউরোপের ভেগান অর্থাৎ কট্টর নিরামিষাশীদের জন্য সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে হুহু করে বাড়ছে তন্তুময়, উদ্ভিজ্জ মাংস বলে পরিচিত কচি কাঁঠাল বা এঁচোড়ের চাহিদা। রপ্তানিতে ভারতকে টক্কর দিয়ে জোরদার ব্যবসা চালাচ্ছে বাংলাদেশ। আর, সবে কাঁঠাল চাষ শুরু করলেও আক্ষরিক অর্থে 'এঁচড়ে-পাকা' হয়ে দেখা দিতে পারে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনামও।

ভারত থেকে শুধু যে কচি কাঁঠাল রপ্তানি হচ্ছে তা নয়, কাঁঠাল চিপসেরও চাহিদা বাড়ছে

এবং এই চিপস তৈরি এক লাভজনক শিল্প হয়ে গড়ে উঠছে। আবার, কাঁঠাল বিচির গুঁড়ো ময়দার স্বাস্থ্যকর বিকল্প হয়ে বেকারি শিল্পে ব্যবহৃত হবে বলেও রপ্তানি হচ্ছে। তাও, পশ্চিম সবে আমের স্বাদ নিতে শিখছে, এখনও পাকা কাঁঠালের স্বাদ-বর্ণ-গন্ধে মজেনি। বিদেশ দূরে থাক, দিল্লিই এখনও পাকা কাঁঠাল খেতে শেখেনি, যদিও সবজি হিসেবে পঞ্চাশ হাজার টন কাঁঠাল কেরল থেকে চালান হয় দিল্লিতে। কর্ণাটকে অবশ্য কেক-পেস্ট্রি থেকে শুরু বহু খাদ্যে কাঁঠালের ব্যবহার চলছে। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ কাঁঠালের পৌষ্টিক গুণের জন্য ভবিষ্যতে ফল হিসেবে এর জুড়ি থাকবে না, বহু পুষ্টিবিদের অনুমান। কাঁঠাল পাতা দামি পশুখাদ্য, যেমন আসবাব তৈরিতে চাহিদার জন্য কাঁঠালের কাঠ দামি। সব মিলিয়ে কাঁঠাল এক অলরাউন্ডার। আবার, চাষ করা সহজ। খরা, রোগ, কীটাদির আক্রমণ সইতে পারে। বাঙ্গলার শুখা পশ্চিমাঞ্চলের জন্য আদর্শ বাগিচা ফসল।

ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন আগে বলত দিনে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের অন্যূন পাঁচ কাউন্ট ফল, সবজি খাওয়া উচিত। মানে, তিনটি ফল, দু'কাপ সবজি। সম্প্রতি অঙ্কটা আরও বেড়েছে। দিনে একটি কলা অবশ্যই যেন থাকে প্রাতরাশে। ডায়াবিটিক বলে চিন্তা করছেন? এক হাতা ভাত কম খান, কিন্তু এই অতুলনীয় পুষ্টিকর ফলটিকে ছাড়বেন না। তা, এমন চিন্তা চলছে বলেই মধ্যপ্রাচ্যে কলার চাহিদা বাড়ছে এবং ভারতীয় কলার রপ্তানি বাড়ছে দুই অঙ্কের হারে। এখনও পর্যন্ত রপ্তানি হচ্ছে পশ্চিম উপকূল থেকে। কিন্তু এই অধম সমেত অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস, হুগলীর কলা পাতে গিয়ে পড়লে নিতান্ত আহাম্মক ছাড়া প্রতিটি সুস্থ মানুষ সেটিকেই সর্বাগ্রে রসনাতৃপ্তিতে লাগাবেন। হুগলীর কাঁঠালিকলা দিয়ে মাখা যে কোনো খাবার চেখে দেখবেন। তা, বর্তমানে টিস্যু কালচার কৃত জি-৯ বা ক্যাভেন্ডিস ভ্যারাইটির চাষ সাফল্যের সঙ্গে করা গেলেও এই অধমের ধারণা, চাঁপাকলা বা কাঁঠালিকলার উন্নত জাতি বিকাশের প্রয়োজন আছে এবং কলাকে দক্ষিণবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ ফসল করে গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে গবেষণার দরকার আছে। একই সঙ্গে, কলাকেও শিল্পপণ্য করে তোলার সুযোগ আছে। কেরলের দেখাদেখি কলার চিপস এক সুস্বাদু স্ন্যাকস হয়ে উঠতে পারে। থোড়, মোচার মতো সবজি ছাড়াও কলাগাছ জোগায় কলাপাতা, প্লাস্টিকের বিকল্প প্যাকেজিঙের কাঁচামাল হিসেবে যার ব্যবহার চলতে পারে।

রাঢ়বঙ্গ লাগোয়া দক্ষিণবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ জুড়ে সেরা শীতকালীন ফসল হতে পারে রাইসর্ষে। এমনিতেই ভারত তথা বাঙ্গলায় ভোজ্য তেল অমিল। বছরে সত্তর হাজার কোটি টাকার ভোজ্য তেল আমদানি করতে হয় ভারতকে, যার বেশিরভাগ নিম্নমানের পাম তেল। সংখ্যাটা বাড়ছেও। সমস্যার অন্যতম সমাধান হলো বাঙ্গলার মতো রাজ্যে শীতে অনাবাদী পড়ে থাকা লক্ষ লক্ষ হেক্টর ধান জমিতে উপযুক্ত তেলবীজ যথা সর্ষে চাষ করা। বাঙ্গলার চিরাচরিত জাতি বিনয় (বি-৯) খুব সামান্য ফলন দেয়। তার জায়গা নিতে এসে গেছে রাইসর্ষের সংকর জাতি কেশরী ৫১১১ আর কেশরী গোল্ড। বিনয় যেখানে বড়োজোর বিঘেতে দেড় কুইন্টাল ফলন দেয়, সেখানে দুই কেশরী জাতির ফলন বিঘেতে চার কুইন্টাল পর্যন্ত, আছে আরও গুণপনা, যথা ঝড়-জল, রোগ-কীটাদির প্রতি বেশি সহনশীলতা। রাই সর্ষে বলে জাতি দুটি বেশি ঝাড়লো, শুকনো ডালপালা চমৎকার জ্বালানি হিসেবে কাজ করে। রাই সর্ষের শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে বলে নিরন্তর ধান চাষে ক্রমশ 'হার্ড প্যান' তৈরি হয়ে ওঠার হাত থেকে কৃষিজমিকে রক্ষা করে। সর্ষেও বহুমুখী ফসল। সর্ষে শাক শুধু পঞ্জাবির প্রিয় সবজি যে তা নয়। সর্ষে চাষ মৌমাছি পালনের জন্য বিশেষ উপকারী। আর, দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগলে পর্যটনের জন্যও সুসংবাদ। বাঙ্গলার জন্য সর্ষেতেল নিষ্কাশন এক ভারী শিল্প হয়ে উঠতে পারে, বিশেষত ক্যানোলা গুণমানের সর্ষে চাষ শুরু হলে। সেকথা পরে। আপাতত, সর্ষে চাষ বাড়াতে হবে। শুধু রোগের ভয়ে এড়িয়ে যাওয়া গমের বদলে চাষ করা নয়, দরকারে রাক্ষুসে জলপিয়াসী বোরো ধান পিছিয়ে চাষ হোক বা তার বদলে অন্য লাভজনক ফসল চাষ হোক, কেননা, বীরভূম-বর্ধমান সর্ষে চাষের প্রধান অন্তরায় হলো ফসলের স্থায়িত্ব, দেরি হলে চলবে না, বোরো লাগাতে হবে।

সেজন্যই, বোরো ধানের এলাকাতেও উত্তরবঙ্গের মতো জইড বা প্রাক-গ্রীষ্মকালীন ফসল হিসেবে চাষ হোক ভুট্টার। বোরো ধানের চেয়ে অনেক কম জল লাগে, আর ভালো সিঙ্গল ক্রস হাইব্রিড চাষ হলে হেক্টরে বারো তেরো টন, বিঘেতে দেড় টনের মতো ফলন হতেই পারে। ধানের চেয়ে লাভজনক ফসল। প্রধানত পশুখাদ্য হিসেবে চাহিদা থাকলেও ভুট্টার কয়েকশো শিল্প প্রয়োগ আছে। বিহারের পূর্ণিয়া ভুট্টা বিকিকিনির বিরাট আড়ত হয়ে গড়ে উঠলেও বাঙ্গলার রায়গঞ্জ অসীম সম্ভাবনা নিয়ে তাকিয়ে আছে নীতিনির্ধারকদের দিকে।

খরিফে জলদি পাকে এমন ধানের ফসলের পর নভেম্বরের প্রথমেই কেশরী রাইসর্ষে বপন করা গেলে, তার কাটাইয়ের পর অনায়াসে বপন করা যাবে হাইব্রিড ভুট্টা। সেটিও জলদি পাকলে, এক বছর অন্তর একটি ডালশস্য চাষ। বাঙ্গলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই ফসলচক্র রূপায়িত হলে চাষির উপার্জন দ্বিগুণ না হলেই আশ্চর্য হবার কথা। রয়েছে আরও অনেক উপায়। সে কথা পরে।

চিঠিপত্র

মৌলবাদের অত্যাচারে আমার ছেলেটি পড়বে কোথায়?

কালিয়াচক, ধুলাগোড়ি, খড়্গপুর, মল্লারপুর থেকে বর্তমানে উলুবেড়িয়ার তেহট্ট হাইস্কুল সর্বত্র মৌলবাদের তাণ্ডবে সাধারণ মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। গত বছর উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত বাসুদেবপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরে সরস্বতী প্রতিমা ভেঙে দেয় কিছু ধর্মীয় মৌলবাদী মানুষ, আর সম্প্রতি তারই পাশের স্কুল তেহট্ট হাইস্কুলে 'নবিদিবস' পালন করার দাবিতে স্কুলের পঠনপাঠন শিকেয় উঠেছে।

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬ কিছু মৌলবাদী যুবক স্কুলের মধ্যে 'নবিদিবস' পালনের দাবিতে স্কুলে চড়াও হয় এবং তাদের দাবি না মানায় স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বাইরে বেরোতে বাধা দেয়। তারপর ১৪ ডিসেম্বর থেকে স্কুলের পঠনপাঠন বন্ধ হয় এবং গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬ এই মর্মে উলুবেড়িয়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মহাশয়। তারপর থেকে স্কুল বন্ধ থাকে। এরপর ফুরফুরা শরিফের এক ধর্মীয় মৌলবাদী নেতা এসে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে হুমকি দেন। প্রশাসনের আপত্তিতে স্কুলে নবিদিবস পালন করতে না পারার তীব্র আক্রোশে মৌলবাদীরা ফুঁসতে থাকে।

গত ৬ জানুয়ারি ২০১৭ স্কুল চত্বর থেকে র‍্যাফের ক্যাম্প প্রত্যাহার করে স্কুল খোলার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর আবার ২৭ জানুয়ারি ২০১৭ স্কুলে ওই দাবি নিয়ে চড়াও হয় মৌলবাদীরা। স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতির তোয়াক্কা না করেই স্কুলের মধ্যে নবিদিবস পালনের তোড়জোড় শুরু করে দেয় ও স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের ঘেরাও করে রাখে।

আনুমানিক দুপুর ১টা ৪০ নাগাদ উলুবেড়িয়া পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হলেও তারা কোনোরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে সদিচ্ছা দেখায়নি। তাই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা সন্ধ্যাবেলায় একপ্রকার বাধ্য হয়েই স্কুলের চাবি ওই মৌলবাদীদের হাতে দিয়ে কোনোক্রমে বাড়ি ফেরেন। এখনও পর্যন্ত তেহট্ট হাইস্কুল ওই মৌলবাদীদের হাতে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে আপনার সন্তানটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে, সেখানেই যদি মৌলবাদের করাল গ্রাসে পঠনপাঠন শিকেয় ওঠে, তবে আমাদের সন্তানরা যাবে কোথায়?

—সুমন সরকার,
সাঁকরাইল, হাওড়া।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিদায় হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই!

মার্কিন সিনেটে শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি ২০২০) ৫১-৪৯ ভোটে সাক্ষী না ডাকার পক্ষে প্রস্তাব পাশ হয়। দু'জন রিপাবলিকান সিনেটর ডেমোক্রেটদের পক্ষে ভোট দেন, কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। এ দু'জন সিনেটর হচ্ছেন, মিট রামানি এবং সুজান কলিস। মার্কিন ইতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম। ১৮৬৮ সালে প্রেসিডেন্ট এন্ড্রু জনসন এবং ১৯৯৮ সালে বিল ক্লিন্টনের সময় সক্ষী ডাকা হয়েছিল। হাউস স্পিকার ডেমক্রেট ন্যান্সি পেলোসি বলেছেন, 'এটা কভারআপ'। রিপাবলিকনরা বলেছেন, হাউস ট্রায়াল বেশ ক'জন সাক্ষী ডাকা হয়েছিল, নতুন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই।

আগামী সোম ও মঙ্গলবার সিনেটে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হবে, বুধবার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০, চূড়ান্ত ভোট। প্রেসিডেন্ট 'খালাস' পাবেন তা প্রায় নিশ্চিত। একশো' সদস্যের সিনেটে রিপাবলিকানদের ৫৩টি ভোট আছে, ডেমক্রেটদের ৪৭। একজন প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতচ্যুত করতে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট, অর্থাৎ ৬৭টি ভোট দরকার। ২০টি ভোট ডেমক্রেটরা কোথা থেকে পাবেন? সিনেটে খুব সম্ভবত পার্টি লাইনে ভোট হবে। কংগ্রেসেও পার্টি লাইনে ভোট হয়েছিল, মাত্র ৩ জন ডেমক্রেট প্রেসিডেন্টকে ইম্পিচ করতে ভোট দেননি। একজন রিপাবলিকান পক্ষ ত্যাগ করেননি।

মার্কিন জনগণ এবারকার ইম্পিচমেন্ট প্রক্রিয়ায় তেমন উৎসাহী নন, কারণ এটি পুরোপুরি পার্টিজান লাইনে চলছে। সংখ্যাধিক্যের জোরে হাউসে ডেমক্রেটরা পুরোপুরি পার্টিজান ছিলেন, একই কারণে সিনেটে রিপাবলিকনরা পার্টিজান লাইনেই হাঁটছেন বা হাঁটবেন। বুধবার হয়তো ইম্পিচমেন্ট অধ্যায় শেষ হবে, কিন্তু এর জের চলবে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত। মঙ্গলবার ৩ নভেম্বর ২০২০ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ট্রাম্প বলছেন, ডেমক্রেটরা জিতবে না তাই এই নাটক! পেলোসি বলেছেন, আপনার ওই সিল আজীবন থাকবে।

—সিতাংশু গুহ,
নিউইয়র্ক।

প্যাটেল নেহরুর টক্কর নয়

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সম্বন্ধিত আমার প্রতিবেদনের সূত্রে বিমলেন্দু ঘোষ ২০.১.২০২০-এর পত্রে তাঁর সংযোজন দিয়েছেন। লেখাটি অভিনিবেশ সহকারে পাঠের জন্য বিমলেন্দুবাবুকে ধন্যবাদ।

শ্রী ঘোষের পত্রের প্রথম অংশটি সম্পর্কে বলি— আমার লেখায় বল্লভভাই নেহরুর সঙ্গে টক্কর দেওয়ার জন্য ব্যারিস্টার হতে বিলেত গিয়েছিলেন এমন উল্লেখ নেই। বলা হয়েছে তাঁর (নেহরুর) মতো পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে যুক্তি দিয়ে কোনো বিষয়ে সহমত্যে আনতে গেলে নিজেরও প্রশিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন হয়।

এই প্রসঙ্গে বল্লভভাইয়ের ব্যারিস্টার পরিচয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখিত। তিনি যে প্রশিক্ষিত ব্যারিস্টার ছিলেন এটা আমাদের অনেকেরই অজানা কেননা সে তথ্য সেভাবে

পরিবেশিতই হয়নি। বিমলেন্দুবাবুর প্যাটেলের বদলে তাঁর দাদার ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যাওয়ার তথ্য সম্পূর্ণ সঠিক। প্যাটেলের ওপর তথ্যচিত্র ও প্রামাণ্যগ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। তবে আমার লেখার অভিমুখ এই প্রসঙ্গে ছিল না। সোমনাথ মন্দির নির্মাণের তর্ক উঠেছিল স্বাধীনতার পর আর নেহরু ও প্যাটেল ব্যারিস্টার হয়েছিলেন যথাক্রমে ১৯১২ ও ১৯১৩ সালে। তাই রেষারেষির প্রসঙ্গটি পরিহারযোগ্য।

দ্বিতীয় অংশটি আইএনএ যুদ্ধবন্দিদের লালকেল্লার বিচারে কংগ্রেস বাধ্য হয়ে যে ১৭ জন আইনজ্ঞের ডিফেন্স টিম তৈরি করেছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন ভুলাভাই দেশাই, অরুণা আসফ আলি, তেজ বাহাদুর সপ্রু, নেহরু, স্যার কৈলাশনাথ কাটজুর মতো প্রবাদপ্রতিম সব ব্যক্তিত্ব। সেখানে আইনজ্ঞ হিসেবে নেহরু খুব সুপরিচিত ছিলেন না। বিমলেন্দুবাবু বলেছেন দেশাই আদালতে লড়াই জেতেননি, ঠিকই। জেতার অবকাশ ছিল না। Treason বা দেশদ্রোহ ও Waging War against country (যেহেতু আদিতে তাঁরা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিরই সদস্য ছিলেন) গর্হিত অপরাধ। ভারত ইতিহাসের মোড় ঘোরানো এই মামলায় একাধারে সামরিক আইন, সাংবিধানিক আইন, আন্তর্জাতিক আইন ও এর অগ্রগতির সঙ্গে সারা দেশ জুড়ে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। নভেম্বর ১৯৪৫ থেকে ৪৬-এর মে মাস অবধি চলা এই বিচার প্রক্রিয়ায় দেশবাসী যতই আজাদ হিন্দ ফৌজের মরণপণ লড়াইয়ের ব্যাপারে সচেতন হতে থাকে ইংরেজ শক্তি আতঙ্কিত হয়ে পড়তে থাকে। সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ শুরু হয়। এসব ভিন্ন ইতিহাস, অনেকেই জানেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হতমান ইংরেজের তখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আর দেশ জোড়া বিদ্রোহের ঝুঁকি নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিরুপায় সেনাধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল অচিনলেক একটি ফাঁক বার করে তিন আজাদ হিন্দ সেনানির দ্বীপান্তর রদ করেন। ভুলাভাই দেশাই তাঁর তীব্র যুক্তিজালে দেশব্যাপী যে আবহের সৃষ্টি করেছিলেন শাস্তি মকুব তারই প্রত্যক্ষ কার্য-কারণ। এর পরবর্তী কোর্ট মার্শালগুলিতেও সাজা মকুবের ধারাই বজায় ছিল।

—সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
শিবপুর হাওড়া।

সুপ্রিম কোর্টের ওপর ভরসা রাখুন

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনকে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী এবং সংবিধান বিরোধী বলে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বেশ কিছু বিরোধীদল আওয়াজ তুলেছে। কিন্তু মোদী সরকারের নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের মতো প্রয়াস পূর্বে কমপক্ষে আরও ৫ বার নেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হলেও, ইতিপূর্বে বাংলাদেশ থেকে আগতদের জন্য এরূপ কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অবিচারের পর্যায়টি শুরু হয় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সৌজন্যে। ১৯৭১ সালের ২৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে একটি চিঠি লিখে সমস্ত রাজ্য সরকারকে নির্দেশ জারি করে বলা হয়, ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের পর পূর্ববঙ্গ থেকে যে সমস্ত উদ্বাস্তু ভারতে এসেছেন, তাদের যেন সংবিধানের নাগরিকত্ব আইনের ৫ (১) (এ) মোতাবেক ভারতীয় নাগরিক হিসেবে নথিভুক্ত না করা হয়। (চিঠি নং ২৬০১১/১৬/ ৭১-১০)। সংবিধান বিরোধী এই নির্দেশ এখনও বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ওপর কার্যকারী হয়ে চলছে। এই প্রথম বর্তমান সরকারের বদান্যতায় জাতীয় স্তরে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে সংসদের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন হলো।

১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের পর সে দেশ থেকে যেসব উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদের ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব আইনের ১৯৫৬ সংশোধন করা হয়েছিল। তখন গুজরাট ও রাজস্থানের ৬ জেলায় বহু লোককে সংস্থাপন দেওয়া হয়েছিল। তথ্য বলছে তখন গুজরাটের কচ্ছ, পাটান, বনসকান্থা ও আমেদাবাদ জেলায় অগণিত লোককে সংস্থাপন দেওয়া হয়েছে। একইভাবে রাজস্থানের বদমায় ও জয়সালমের এই দুই জেলাতেও সংস্থাপন দেওয়া হয়েছে। ওইসব জেলায় ডিএমদের মাধ্যমে এদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়।

পরবর্তীতে অটলবিহারী বাজপেয়ী নেতৃত্বাধীন সরকারও নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করেছে। ২৮.২.২০০৪ তারিখে এই সংক্রান্ত নোটিফিকেশন জারি হয়। ১.৩.২০০৪ তারিখে তা প্রকাশ করা হয় এবং এক বছরের জন্য বহু লোককে সংস্থাপন দেওয়া হয়। পরবর্তীতে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করা হয়। পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দিতে ২২.২.২০০৫ তারিখে নোটিফেকেশন জারি করা হয়। পরবর্তীতে ইউপিএ সরকারের আমলেই ফের ১২.৭.২০০৬ তারিখে এই আইনের পরিধি আরও তিন বছরের জন্য বৃদ্ধি করে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যে কংগ্রেস দল নাগরিকত্ব আইন (সংশোধনী)-কে সাম্প্রদায়িক ও সংবিধান বিরোধী বলতে উঠে পড়ে লেগেছে, সেই দলের সরকার ২০০৫ এবং ২০০৬ সালে একই ধরনের আইন সংশোধন করেছে। তবে তার থেকেও বেশি আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো বর্তমান রাজ্য সরকারের ভূমিকা। নিজ রাজ্যের লক্ষ লক্ষ শরণার্থী উদ্বাস্তুদের জীবন-মরণের সমস্যাকে অবজ্ঞা করে চলেছে এই সরকার। সিএএ-এর সঙ্গে অহেতুক এনআরসি-র সংযুক্তিকরণ করে কতিপয় অবুঝ লোককে খেপিয়ে তুলছে। সিএএ নিয়ে সারা দেশে আগুন ছড়িয়ে দিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন।

সিএএ-এর ভবিষ্যৎ সুপ্রিমকোর্টের বিবেচনাধীন। ১৫০টি মামলা হয়েছে আইনটির বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে। যারা গণতন্ত্র তথা সংবিধান অনুসারী, মনে হয় তারাই মামলাগুলি করেছেন। কাজেই আশা করা যেতে পারে গণতন্ত্রের মুখ্যস্তম্ভ সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে অপেক্ষা করা উচিত। অকারণে 'এনআরসি ছি-ছি' রবে চিলচিৎকার না করাই শ্রেয়।

—জহরলাল পাল,
শিলচর, অসম।

মরসুমি মাছের আটপৌরে রান্না

সুতপা বসাক ভড়

শীত মানেই রসনার তৃপ্তি। নানারকম মরসুমি ফল-শাকসবজির সঙ্গে মরসুমি মাছও আমাদের খাদ্যতালিকায় এনে দেয় অপূর্ব স্বাদ। বর্তমানে সারা বছরই প্রায় সব পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের অবদানে প্রখর গ্রীষ্মেও শীতের সবজির খোঁজ মেলে বাজারে, কিন্তু 'যে সময়ের যা...'। সুতরাং, শীতের ফল-সবজি- মাছের স্বাদ ও গুণবত্তা শীতেই হয় সবথেকে বেশি। ছোটো-মাঝারি- বড়ো নানারকম মাছ পাওয়া যায় এই সময়। ঠাণ্ডার জন্য মাছগুলি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না, টাটকা থাকে অনেকক্ষণ। সেজন্য সকালের বাজারে বেশ টাটকা টানটান মাছগুলোয় যখন সকালের রেদ্দুর পড়ে, তখন তা দেখেই ভালো লাগে।

এই সময় পাওয়া যায় বুজুরি ট্যাংরা মাছ, বাতাসি মাছ (ট্যাংরার সঙ্গে বেশ মিল আছে)। এগুলি নদীর মাছ— সেজন্য মিষ্টি স্বাদ। সংকরের প্রভাব থেকেও মুক্ত। ছোটো ছোটো বুজুরি ট্যাংরা বছরের অন্যসময় বিশেষ চোখে পড়ে না। ট্যাংরার কাঁটা খুবই সাংঘাতিক, তবে বাজার থেকেই সব কেটে পরিষ্কার করে দেয় আজকাল। সেজন্য ওই চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা যায়। এরপর সেগুলি বেশি করে নুন দিয়ে কচলে ধুয়ে নিতে হয়। এর ফলে, মাছের গায়ে লেগে থাকা লালা সহজেই পরিষ্কার হয়ে যায় এবং আঁশটে গন্ধও কেটে যায়। ভালোভাবে ধুয়ে নুন-হলুদ-তেল মাখিয়ে নিতে হবে। কড়াইতে সরষের তেল অনেক বেশি গরম করে তাতে একটু নুন দিয়ে নেড়ে নিলে তেল ছিটকোবে না। এরপর, আঁচ কমিয়ে নিয়ে মাছগুলো হালকা ভেজে তুলে নিয়ে কড়াইতে কালো জিরে, কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিতে হবে। সরু-সরু করে কাটা আলু এবং পেঁয়াজকলি আন্দাজমতো দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে। মিনিট দু'য়েক পরে নুন-হলুদ-লঙ্কাগুঁড়ো এবং স্বাদ অনুসারে রসুনবাটা দিয়ে জল দিতে হবে। একটু ফুটে উঠলে মাছ দিয়ে আরও দশমিনিট খুব ঢিমে আঁচে রাখতে হবে। এখন বেশ কয়েকটা মুখ-চেরা কাঁচালঙ্কা এবং ধনেপাতা দিয়ে গ্যাস বন্ধ করে কড়াই ঢাকা দিতে হবে। পাঁচ মিনিট পরে খুললেই তৈরি বুজুরি ট্যাংরার ঝোল!

বাতাসি মাছও এইভাবে রান্না করা যায়। আমাদের স্মৃতি-বিজড়িত রান্নার স্বাদ অবশ্যই পাবো।

খয়রা মাছ দেখতে ভারি সুন্দর। রূপোর মতো চকচকে মাছের মুখের কাছে কালো তিল দেখে সহজেই খয়রা মাছ চেনা যায়। কেটে আঁশ ছাড়িয়ে নুন-হলুদ মাখিয়ে খানিকক্ষণ রাখার পরে সরষের তেলে হালকা ভেজে তুলে নিতে হবে। এই তেলেই হলুদ সরষে এবং কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিয়ে নুন-হলুদ দিয়ে পরিমাণ মতো জল দিতে হবে। ঢিমে আঁচে ফুটতে শুরু হলে মাছগুলো সাবধানে ঝোলের মধ্যে ছাড়তে হবে। মিনিট দশেক পরে সরষেবাটা, মুখ-চেরা কাঁচালঙ্কা, কাঁচা সরষের তেল দিয়ে ঢাকা দিতে হবে। পাঁচ মিনিট পরে ঢাকা খুললেই তৈরি। এছাড়া মুচমুচে করে ভাজা খয়রা মাছ ডালের সঙ্গে খুবই উপাদেয়।

কাকিলামাছ অনেকের কাছে অজানা। সরু, লম্বা, সাদা মাছগুলোকে দু'তিন ইঞ্চি মাপের কেটে নুন-হলুদ মাখিয়ে সরষের তেলে হালকা ভেজে তুলে নিতে হবে। ওই তেলে কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে রসুনবাটা, নুন, হলুদ, লঙ্কাগুঁড়ো জলে গুলে ঝোলের আন্দাজমতো জল দিতে হবে। মাছগুলো ছেড়ে ঢাকা দিয়ে হবে। ঢিমে আঁচে দশ মিনিটের মধ্যে মাছ রান্না হয়ে যাবে। তখন চেরা কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা সাজিয়ে নিলেই পরিবেশনের জন্য তৈরি কাকিলা মাছের ঝোল। অপূর্ব স্বাদ এই মাছটির!

শীতের মরসুমের এই মাছগুলির মূল্য মধ্যবিত্তের আয়ত্তের মধ্যে। একটু যত্ন করে রান্না করলে আমরা হারিয়ে যাওয়া মাছের ঝোলের রসাস্বাদন করতে পারব। বাড়ির মহিলাদের খুব একটা ঝক্কি হবে না এগুলি রান্না করতে। প্রিয়জনেদের থালায় এগুলি তুলে দিতে পারলে খুবই আত্মতৃপ্তি পাবো আমরা। নতুন প্রজন্মও বাজার চলতি খাবার ফেলে পারম্পরিক রান্নার স্বাদ গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে। ▮

মাইগ্রেনের সমস্যায় হোমিওপ্যাথি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

মাইগ্রেনের মাথাব্যথা যে কী মারাত্মক, তা যার হয়েছে সেই ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। চোখ ও অর্ধেক কপাল থেকে শুরু করে মাথার একদিকে ব্যথা হতে থাকে। এই ব্যথার জন্য মস্তিষ্কের স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়, মস্তিষ্কের মেমব্রেনের (আবরণী) ধমনিগুলো ফুলে যেতে থাকে, মাথাব্যথার সঙ্গে গা বমি ভাব বা কখনও বমি হতে থাকে। এর ফলে রোগীর দৃষ্টিভ্রমও হতে পারে। মাইগ্রেন রোগটি সাধারণত মহিলাদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। তবে মনে রাখতে হবে মাথার একদিকে ব্যথা মানেই মাইগ্রেন নয়, চোখের পাওয়ারের গোলমাল, ব্রেন টিউমার, ব্রেন হ্যামারেজ বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ইত্যাদি কারণেও মাথাব্যথা হতে পারে।

মাইগ্রেনের মুল কারণ অতিরিক্ত টেনশন, কেউ যদি দিনের পর দিন কোনও ব্যাপার নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করেন, তবে তিনি অবধারিত ভাবে মাইগ্রেনের শিকার হবেন, কেননা এর ফলে স্নায়ুর উপর চাপ পড়বে। তাছাড়া এই রোগটি বংশগত বলেও চিকিৎসকরা মনে করেন। মা বা বাবা কারও একজনের মাইগ্রেন থাকলে সন্তানের হতে পারে।

চকোলেট, পনির, কফির মধ্যেকার ক্যাফেইন বাড়িয়ে তোলে মাইগ্রেনের প্রকোপ।

জন্মনিরোধক ওষুধ খাওয়া, দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারে কাজ করা, মোবাইল নিয়ে সারাদিন ঘাঁটাঘাঁটি ইত্যাদিও বাড়িয়ে দেয় মাইগ্রেন। অতি উজ্জ্বল আলো এই রোগকে তরান্বিত করে।

উপসর্গ :

মাইগ্রেন সাধারণত বয়ঃসন্ধিকাল থেকে শুরু হয়ে মাঝ বয়স পর্যন্ত চলতে পারে। বয়স ৫৫ ছাড়ালে এই রোগের প্রকোপ কিছুটা কমে। মাইগ্রেন একবার শুরু হলে কয়েক ঘণ্টা থেকে শুরু করে কয়েকদিন পর্যন্ত থাকতে পারে। অতিরিক্ত হইতোলা, আওয়াজে সমস্যা, মনোযোগ নষ্ট হওয়া, বিরক্তিবোধ করার মতো লক্ষণগুলো মাথাব্যথা শুরু হওয়ার আগে থেকে হতে থাকে।

তীব্র মাথব্যথায় মনে হয় মাথার পিছনে কেউ যেন হাতুড়ি মারছে। মাথার যে কোনও অংশ থেকে এই ব্যথা শুরু হয়ে পরে পুরো মাথায় ছড়িয়ে পড়ে। মাথব্যাথার সময় শব্দ ও আলোর সংস্পর্শে থাকলে ব্যথা বেড়ে যায়।

কীভাবে মুক্তি সম্ভব :

মাইগ্রেনের চিকিৎসায় পেইনকিলার খেয়ে সাময়িক মুক্তি মিলবে, তবে দীর্ঘমেয়াদি ওষুধ হিসাবে খেলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পরিমিত ঘুম যাতে হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। কম আলোতে কাজ করা চলবে না। অতিরিক্ত রোদ লাগানো যাবে না। রোদে বেরোতে গেলে সবসময় ছাতা ও সানগ্লাস ব্যবহার করতে হবে। কম্পিউটারে কাজ করতে গেলে মাঝে মধ্যে বিরতি নিতে হবে। পর্যাপ্ত জল খেতে হবে। বমি হলে ওষুধ খাওয়া প্রয়োজন।

ডায়েটের ভূমিকা :

কিছু খাবার রয়েছে যা মাইগ্রেন প্রতিরোধে সাহায্য করে, যেমন ম্যাগনেসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার, ঢেঁকি ছাঁটা চালের ভাত, আলু, বার্লি। ফলের মধ্যে চলতে পারে খেজুর ও ডুমুর। ডুমুরের তরকারি করেও রান্না করা যায়। সবুজ, হলুদ ও কমলা রঙের শাকসবজি নিয়মিত ডায়েট চার্টে রাখতে হবে। ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি মাইগ্রেন প্রতিরোধ করে। আদাগুঁড়ো জলে মিশিয়ে খেলেও গা বমি ভাবটা কমে।

আবার বেশ কিছু খাবার রোগটিকে তরান্বিত করে। যেমন কফি, কোল্ড ড্রিংক্স, চকোলেট, আইসক্রিম, মাখন, টমেটো, বা টকজাতীয় ফল। কারও কারও ক্ষেত্রে পাউরুটি ও পেঁয়াজ থেকে সমস্যা হয়। ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন খাবারে সমস্যা হতে পারে। তাই সবচেয়ে ভালো হয় প্রতিদিন কী খাবার খেলেন ও কোন খাবার খাওয়ার পর মাথাযন্ত্রণা হলো, তা খুঁজে বের করা।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা :

লক্ষণ, কারণ ও মায়জম মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধ প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়। আমার চিকিৎসক জীবনে অনেক সুফল পেয়েছি। ▮

মহাদেব কেন মহিলাদের আদর্শ পুরুষ

পারুল মণ্ডল সিংহ

হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের ত্রয়োদশ তিথির রাত্রি ও চতুর্দশী তিথির দিন গোটা ভারতবর্ষে 'মহাশিবরাত্রি' হিসেবে পালিত হয়। যদিও হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রতিমাসেই একটি করে শিবরাত্রি পালিত হয়। প্রতিমাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথির রাত্রি শিবরাত্রি হিসেবে পালিত হয় এবং মহিলারা বিশেষ করে উত্তর ভারতীয় মহিলারা ওই দিনটি শিবরাত্রির ব্রত ও পূজা করেন। কিন্তু ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের এই শিবরাত্রিটি 'মহাশিবরাত্রি' হিসেবে অতি আড়ম্বর ও মহাধুমধামে গোটা দেশে পালিত হয়ে থাকে। মহাশিবরাত্রির বর্ণনা পুরাণগুলিতে সবিস্তারে আছে। বিশেষ করে স্কন্দপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ এবং পদ্মপুরাণে মহাশিবরাত্রির পূজা ও ব্রতের বর্ণনা করা রয়েছে।

ফাল্গুন মাসের শিবরাত্রিকে মহাশিবরাত্রি হিসেবে পালন করার পেছনে কয়েকটি বিশেষ কারণ রয়েছে। ধর্মজ্ঞদের মতে এই দিনই মাঝরাত্রে আকার ও মূর্তিহীন ভগবান সদাশিব লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মাঝরাত্রে ভগবান শিব নিজেকে 'লিঙ্গোদ্ভব মূর্তি' রূপে প্রকটিত করেন। এই মহাশিবরাত্রির ঠিক ১৮০ দিন পর সদাশিবের বিষ্ণু অবতার গোকুলে কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। আবার অনেকের মতে এই দিনই স্বর্গলোকে 'ক্ষীরেরসাগর মন্থন করে যে হলাহলের উদ্ভব হয়েছিল তা শিব নিজ কণ্ঠে ধারণ করে 'নীলকণ্ঠ' হয়েছিলেন। হলাহল থেকে স্বর্গ-মর্ত্যকে রক্ষা করার জন্য মহাসমারোহে তাঁর পূজা করা হয়।

তবে মহাশিবরাত্রি পালনের পশ্চাতে সবথেকে প্রচলিত কারণ যেটি রয়েছে সেটি হলো ওইদিনই রাত্রিবেলা শিব ও পার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। সেই জন্যই হয়তো বেশিরভাগ হিন্দু দেব-দেবীর পূজা দিনেরবেলা হলেও মহাশিবরাত্রি রাত্রে পালিত হয়। হিন্দু শাস্ত্রমতে বর্তমান দিনের উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলার ত্রিযুগীনারায়ণ গ্রামে অবস্থিত ত্রিযুগীনারায়ণ মন্দিরে শিবরাত্রিতে শিব ও পার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। এখন ওই মন্দিরটি হিন্দুদের অন্যতম তীর্থকেন্দ্র। মন্দিরটির বৈশিষ্ট্য

হলো একটি পবিত্র আগুন মন্দিরটির সামনে সদা জ্বলতে থাকে। বিশ্বাস করা হয় যে শিব-পার্বতীর বিবাহের সময়কাল থেকেই এই শিখা জ্বলে চলেছে। এই জন্য এই মন্দিরটিকে 'অখণ্ডধুনী মন্দির'ও বলা হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে ওই মন্দিরটি সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ ও দ্বাপরযুগ—এই তিনটি যুগের প্রতীকী রূপে গড়ে উঠেছিল, তাই এর নাম ত্রিযুগীনারায়ণ মন্দির।

পার্বতী ছিলেন হিমালয়ের রাজা হিমবানের কন্যা। পর্বতের কন্যা বলে নাম হয়েছিল পার্বতী। শিবের প্রথমপক্ষের স্ত্রী সতীই পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়ে পার্বতী রূপে জন্মেছিলেন। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সতী মহাদেব শিবকে বিবাহ করেছিলেন। পিতৃগৃহে গেলে সতীর পিতা মহাদেবকে অপমান করেন। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে সতী দেহত্যাগ করেন। ক্ষোভে দুঃখে মহাদেব সতীর মৃতদেহ কাঁধে তুলে নিয়ে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করলে স্বর্গ-মর্ত্যলোকের অস্তিত্ব তথা সৃষ্টি বিপন্ন হয়ে পড়ে। তখন মহাদেবকে শান্ত করানোর জন্য বিষ্ণু সতীর দেহ তার সুদর্শন চক্র দ্বারা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করতে থাকেন। সতীর দেহের অংশ মর্ত্যলোকে যেখানে যেখানে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সেখানেই গড়ে উঠেছিল শক্তিপীঠ। এই শক্তিপীঠগুলি যুগযুগান্ত ধরে হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র রূপে বিখ্যাত। সতী পরজন্মে পার্বতী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পার্বতী প্রথমে তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যে মহাদেবকে বশবর্তী করতে চাইলেও মহাদেব তাতে সন্তুষ্ট হননি। পরবর্তীকালে পার্বতী গৌরীকুণ্ডে কঠিন তপস্যা করেন। তার কঠোর তপস্যায় শিব সন্তুষ্ট হন এবং পার্বতীকে বিবাহ করতে সম্মত হন।

কথিত আছে যে, গুপ্তকাশী নামক স্থানে মহাদেব শিব পার্বতীকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। বিবাহের পূর্বে শিব-পার্বতী চারটি কুণ্ডে স্নান করেন। কুণ্ডগুলি হলো রুদ্রকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, ব্রহ্মাকুণ্ড ও সরস্বতী কুণ্ড। শিব ও পার্বতীর বিবাহে বিষ্ণু পার্বতীর ভ্রাতা রূপে বিবাহদান করেন এবং বিবাহে পুরোহিত রূপে ব্রহ্মা স্বয়ং উপস্থিত থাকেন।

মহাশিবরাত্রি বিশেষ করে হিন্দু

শিবক্ষেত্র বারাণসীর

অনন্যা চক্রবর্তী

হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী বারণসী মহাদেব শিবের নিজের শহর। এ শহর তিনি নিজেই সৃষ্টি করেছিলেন। বারাণসীতে তিনি বিশ্বনাথ রূপে বিরাজমান। ভারতের অতি বিখ্যাত শৈবতীর্থ দ্বাদশ জোতির্লিঙ্গমের অন্যতম বারাণসীর বিশ্বনাথ। প্রতি বছর মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে প্রায় সারা ভারতবর্ষ মিলিত হয় এখানে। বারাণসীতে শিব শুধু দেবতা নন, আত্মার আত্মীয়। স্টেশনে ট্রেন থেকে নামামাত্র যার সান্নিধ্য পাওয়ার যায়। ছোটোবড়ো যে কোনও দোকানে আপনি যান, মহাদেবের ছবি দেখতে পাবেন। একবার শুধু বলুন, হর হর মহাদেব— দেখবেন পথের শিশুও একগাল হেসে এক হাত শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বলছে, হর হর মহাদেব! আসলে শিব, মহাদেব, মহেশ্বর—এই নামগুলো বারাণসীর হাওয়ায় মিশে আছে। নিঃশ্বাস নিলেই বুকের ভেতর ঢুকে পড়ে। এমন একটি শহর মহাশিবরাত্রি কীভাবে পালন করে? এ প্রশ্নের উত্তরে শুধু মহা ধুমধামের সঙ্গে পালন করে বললে কিছুই বলা হয় না। বলা উচিত, শহরের প্রায় প্রত্যেক হিন্দু এই দিন উপাবাসী থেকে শিবপুজো করেন। দুধ ও মধু দিয়ে শিবলিঙ্গকে স্নান করান। ফুলের আড়তগুলোতে বেলপাতার পাহাড় জমে থাকে। মহাদেব বেলপাতা পছন্দ করেন। তাঁর প্রিয় ফুল ধুতরো আর আকন্দ। প্রিয় ফল বেল আর নারকেল। আর মিস্টির মধ্যে প্রিয় বোঁদে। বারাণসীতে যা বুন্দি নামে বিখ্যাত। সবাই বাজারে বাজারে এই সব জিনিসপত্র কেনেন। কেনাকাটি সারা হলে শুরু হয় পুজোর প্রস্তুতি। বারাণসীর সবাই পুজোর জন্য বিশ্বনাথ মন্দিরে যান না। তবে তা না যান, এ শহরে

মহিলাদের কাছে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্রত ও পূজা। এইদিন অবিবাহিত মেয়েরা মহাদেব শিবের মতো স্বামী পাওয়ার জন্য ও বিবাহিত মহিলারা তাদের স্বামীর মঙ্গলকামনায় ব্রতটি করে থাকেন। মহিলারা সারাদিন উপবাসী থাকার পর রাতে চার প্রহরে চারবার পঞ্চামৃত, ফল, ফুল, বেলপাতা, আকন্দফুল সহযোগে পূজা করেন। শিবলিঙ্গে পঞ্চামৃত ঢালার পরই মহিলারা জল ও প্রসাদ গ্রহণ করেন। হিন্দুদের এত দেবতা থাকতে মহিলারা শিব ঠাকুরকেই তাদের আদর্শ স্বামীরূপে কেন পেতে চান এই প্রশ্ন যেন গভীর। সারাদেহে ছাইভস্ম মেখে সারাদিন ধ্যান করা, জগৎ সংসার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন শিবকেই স্বামী হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছার পশ্চাতে প্রধান কারণ হলো মহাদেব শিব কিন্তু পার্বতীর রূপ ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হননি, পার্বতীর কঠোর তপস্যা, একাগ্রতা ও মানসিক শক্তিকে সম্মান জানিয়ে বিবাহে সম্মত হয়েছিলেন। যে পুরুষ নারীর সৌন্দর্য নয়, নারীর অন্তর্নিহিত গুণকে স্বীকৃতি দেন, নারীর রূপের তুলনায় তার দক্ষতা, পারদর্শিতা, গুণকে সম্মান দেন তিনি তো প্রকৃত পতি হওয়ার অধিকারী। নারীর রূপ সময়ের সঙ্গে ম্লান হয়ে যায় কিন্তু গুণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও পারদর্শিতা বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়ত, মহাদেব জাগতিক ব্যাপারে উদাসীন হলেও তাঁর স্ত্রী সতী পিত্রালয়ে অপমানিত হলে মহাদেব সেই অপমান কোনোমতেই সহ্য করতে পারেননি। স্ত্রীর মৃতদেহ কাঁধে তুলে নিয়ে গোটা সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়ে উঠেছিলেন। যে স্ত্রীর স্বামী তাকে সম্মান করেন তিনি হলেন প্রকৃত অর্থেই সৌভাগ্যবতী নারী।

সর্বোপরি, আজকের যুগে যে নারীক্ষমতায়নের কথা বলা হচ্ছে, যুগাতীত কালে মহাদেব শিব তার স্ত্রীকে শক্তিরূপে মান্যতা দিয়েছিলেন। স্বর্গ ও মর্ত্যধামে যখন আসুরিক শক্তির ত্রাসে দেবতা মানব ত্রাহি ত্রাহি করছেন সেই সময় মহাদেব শিব তার স্ত্রীকে অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত করে অসুর দমনে পাঠিয়েছিলেন। সমস্ত দেবতার মধ্যে একমাত্র শিবের স্ত্রীই শক্তিরূপে পূজিতা হন। দুর্গা ও কালী শিবপত্নীর দুটি শক্তিরূপ। অধর্ম নাশ করে তাঁরা জগতে ধর্ম সংস্থাপন করেছিলেন। যুগাতীত কালে দেবাদিদেব মহাদেব স্ত্রীকে শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন— এমন রূপ পুরুষকে নিজের স্বামী হিসেবে পাওয়ার স্বপ্ন প্রতিটি নারীর থাকে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, হিন্দু ধর্মে শিব ঠাকুরকেই পতিরূপে পাওয়ার জন্য এই পূজাবিধি প্রচলন করার মাধ্যমে কিন্তু নারীর ক্ষমতায়নকেই উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। নারীর রূপের উর্ধ্বে গুণকে শিরোধার্য করা হয়েছে। অধর্মনাশে নারীকে শক্তিরূপিণী হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

শিবরাত্রি শুধু ভারতবর্ষেই নয়, ভারতবর্ষের বাইরে নেপাল, মরিশাসের মতো দেশেও অতি ধুমধামে পালিত হয়ে থাকে। মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষেরাও ব্রত, উপবাস-সহ শিবঠাকুরের পূজা করেন। শিবের মতো সাম্যদৃষ্টি, উদারতা, দেব-মানব-ইতর-পশু সকল সৃষ্টিকে সমান গুরুত্ব দেওয়া এবং সর্বোপরি ষড়রিপু ও মায়ার জগতের ঊর্ধ্বে প্রশান্ত চিত্ত হওয়ার মতো গুণ গোটা মানব সমাজেরই আদর্শ। ■

মহাশিবরাত্রি উৎসব

বারাণসীর সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশ্বনাথ মন্দিরের পূজারি— সবাই এই কাহিনিটিকেই অনুসরণ করেন।

শিবের মন্দিরের অভাব নেই। বিশ্বনাথ মন্দিরমুখী রাস্তাগুলো জনসমুদ্রে পরিণত হয়। একেবারে আক্ষরিক অর্থেই জনসমুদ্র। গুজরাটি, মারাঠি, পঞ্জাবি, তামিল, তেলুগু, ওড়িয়া, বাঙ্গালি, অসমীয়া— সব একাকার। সবার হাতে দুধের পাত্র। সবার কণ্ঠে হর হর মহাদেব। কিংবা, জয় বাবা বিশ্বনাথের জয়।

বারাণসীতে মহাসমারোহে পালিত মহাশিবরাত্রির প্রেক্ষাপটে একটি কাহিনি আছে। ভারতবর্ষের মানুষ সকলেই জানেন সে কাহিনি। ক্ষীর সাগর মন্থনের সময় জলের গভীর থেকে হলাহল উঠল। মারাত্মক বিষক্রিয়ায় সমগ্র সৃষ্টি প্রায় ধ্বংস হবার জোগাড়। আতঙ্কিত দেবতারা কোনও উপায় না দেখে নারদের কাছে গেলেন। নারদ গেলেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু বললেন, মহাদেব ছাড়া আর কেউ এই বিপদ থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করতে পারবেন না। মহাদেব সব শুনে আশ্বস্ত করলেন সবাইকে। তারপর নিজের কণ্ঠে ধারণ করলেন সেই মারাত্মক বিষ। বিষের প্রকোপে তাঁর কণ্ঠ নীল হয়ে গেল। সেই থেকে তিনি নীলকণ্ঠ নামেও পরিচিত হলেন। হিন্দু পুরাণমতে ফাল্গুন মাসের চতুর্দশী তিথিতে মহাদেব কণ্ঠে বিষ ধারণ করেছিলেন। তাই দিনটি মহাশিবরাত্রি হিসেবে পালিত হয়।

জয় শিবশঙ্কর হর ত্রিপুরারি

নিরোদ চন্দ্র শর্মা

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বম্ বম্ বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দুলিছে কপাল মাল।
—স্বামী বিবেকানন্দ।

উপরিউক্ত সঙ্গীতাংশটির বিষয়বস্তু যাকে নিয়ে রচিত সেই দেবতাটির পরিচয় ভক্ত অনুরাগী মাত্রই অবগত আছেন। যাঁর জটামাঝে গঙ্গার গর্জন, অনল উদ্গীরণ করে ত্রিশূল ফলায়, যাঁর ললাটে চন্দ্র বিরাজমান। তিনি যে শিব, মহাদেব, পঞ্চানন একথা বলাই বাহুল্য।

শিব কে? শিবকালীর খেলা কিরূপ? ''মানুষের মঙ্গল কামনা করে তাদের উন্নত করেন বলে এঁকে শিব বলা হয়। শিব হলেন পুরুষ (Potential energy of this universe) এবং কালী হলেন প্রকৃতি (Kinetic Energy of this Universe)। পুরুষ কেবল স্রষ্টা, অধ্যক্ষ বা ঈক্ষণকারী, আর মহাপ্রকৃতি কালী সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডময়, নিয়ত (সর্বদা) নৃত্যশীলা বা লীলাপরায়ণা অর্থাৎ অবিরত সৃষ্টি করে যাচ্ছেন।

Kinetic শক্তি Potential শক্তি থেকে আসছে। তাই মা এক পা (kinetic energy) শিবের বুকে (potential energy) রেখে বা ছুঁয়ে এনার্জি পাচ্ছেন আর বিশ্বের ভাঙাগড়া চালিয়ে যাচ্ছেন'' (কথামৃত চেতনা : পৃ. ৩৫)। মহাদেবকে আশুতোষও বলা হয়। কেননা তিনি সাধককে ঈপ্সিত বর দেন এবং অতি সহজেই। মহাভারতের মহাদেব— বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পূজিত হয়েছেন। যদিও মহাদেব ও বিষ্ণুর মধ্যে কে বড় তা নিয়ে নানা কথা রয়েছে। যদিও ব্রহ্মা থেকে পিশাচ পর্যন্ত সকলেই করেন মহাদেবের পূজা। তিনি মহাকাল। সর্বসংহারক। আবার তাঁর থেকে অভ্যুদয় হয়। সেজন্য তিনি শিব বা শঙ্কর নামে জননশক্তি। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবনে যেমন শিবসদৃশ দেবতা, অশ্বমেধতুল্য যজ্ঞ ও গঙ্গাসদৃশ তীর্থ নেই, তদ্রূপ এই ত্রিভুবনে শিব চতুর্দশীব্রত সম অন্য কোনো ব্রত নেই।

প্রভুমীশমনীশম অশেষ গুণং
গুণহীন মহীষগরাভরনম্।
রণনির্জিত দুর্জয় দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্।।

যিনি সকলের প্রভু ও ঈশ্বর, যার উপরে অন্য কোনো ঈশ্বর নেই, যিনি অশেষ গুণশালী অথচ নির্গুণ, নাগরাজ বাসুকির গরল যাঁর আভরণ, যিনি রণে দুর্জয় দৈত্যপুরী জয় করেছেন সেই মঙ্গলের কল্পবৃক্ষরূপী শিবকে প্রণাম করি।

"জয় শিবশঙ্কর হর ত্রিপুরারি, পাশী পশুপতি পিনাকধারী।
শিরে জটাজুট, কণ্ঠে কালকূট, সাধকজনগণ মানস বিহারী।"

তিনি বেল পাতা নেন মাথা পেতে। তাঁর কাছে নয় কেউ দোষী। গাল বাজালে তিনি হন খুশি। মান অপমান তাঁর কাছে সব সমান। মহাদেব যখন একদিন হিমালয়ে ঘোর তপস্যা করছিলেন তখন পার্বতী খেলার ছলে তাঁর চোখ দুটি পেছন থেকে হাত দিয়ে ঢেকে ফেললে সমগ্র জগৎ অন্ধকারে ডুবে যাবে বুঝে, মহাদেবের কপালে তক্ষুণি এক জ্বলন্ত চোখের উদ্ভব হয়। এইটিই ওই মহাদেবের ধ্বংসকারী তৃতীয় নেত্র। ওই চোখের আগুনেই কামদেব পুড়ে যান। এই তৃতীয় চোখের আগুনে একবার হিমালয়ও পুড়ে গিয়েছিল। পরে তা আবার পার্বতীর প্রীতির জন্য মহাদেবই হিমালয়কে পরম রমণীয় করে তোলেন। আমরা জানি— ব্রহ্মা সৃজনকর্তা। শুধু দেহের (আত্মার নয়), বিষ্ণু পালনকর্তা শুধু দেহের (আত্মার নয়), মহাদেব সংহারকর্তা শুধু দেহের (আত্মার নয়)। বেদে মহাদেব নামে কিছু নেই। তবে রুদ্র বলে এক দেবতার উল্লেখ আছে। ওই রুদ্রই পরবর্তীকালে শিব বা মহাদেব হয়েছেন। শিবের প্রধান অস্ত্র ত্রিশূল। শিবের ধনুকের নাম পিনাক। তাই তাকে পিনাকপাণি বলা হয়। পিনাকী শিবের বিধ্বংসকারী অস্ত্রের নাম পাশুপত। তবে প্রলয়কালে মহাদেব বিষাণ ও ডমরু বাজিয়ে ধ্বংস কার্য করেন।

মহাদেব ভক্তের বাঞ্ছা অল্পেতে পূরণ করেন বলে তাঁকে আশুতোষ বলা হয়। মহাদেব ত্রিপুরাসুর বধ করেছিলেন বলেই ত্রিপুরারি। এছাড়া তাঁর অন্যান্য নামও রয়েছে।

মহাদেব ত্রিপুরারি কেন? পদ্মপুরাণে রয়েছে তারকাসুরের তিন পুত্র— তারাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী। এরা কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে এই বর পেল যে তারা তিনজন তিনটি কামগামী (electronic) আকাশস্থিত নগরে বাস করবে এবং কেউই তাদের মারতে পারবে না। হাজার বছর পরে এদের তিনটি পুর (নগর) এক হলে (docked) অবশ্য তারা তিনজন আবার একসঙ্গে মিলবে তখন যদি কেউ এক বাণে ওই সম্মিলিত ত্রিপুর (docked Towns) ভেদ করতে পারে তাহলে মাত্র তাদের মারা যাবে।

ময়দানব ওই ত্রিপুর স্বর্গে, অন্তরীক্ষে এবং পৃথিবীতে তৈরি করে দেন। ওই ত্রিপুরে তারাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী আশ্রয় নিয়ে ত্রিলোকে নানা অত্যাচার শুরু করে। ব্রহ্মার বরে তাদের কেউ কিছু করতেও পারল না। তখন এই ত্রিপুরাসুরদের বধ করার জন্য দেবতারা মহাদেবের কাছে গেলে মহাদেব তাদের তাঁর দেহের অর্ধেক নিয়ে ত্রিপুর ধ্বংস করতে বলেন। কিন্তু দেবতারা মহাদেবের তেজ ধারণ করতে পারবে না বলায় মহাদেব দেবতাদের তেজের অর্ধেক গ্রহণ করলেন এবং দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে তেজযুক্ত হলেন এবং মহাদেব আখ্যা পেলেন। তারপর বিশ্বকর্মা পৃথিবী দেবী, মন্দর পর্বত, দিগ্‌বিদিক, গ্রহনক্ষত্র এসব দিয়ে এক রথ তৈরি করলেন। চন্দ্র ও সূর্য দিয়ে চাকা গড়লেন। ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের ঘোড়া হলো, সুমেরু পর্বত হলো ধ্বজ এবং পতাকা হলো মেঘ। সংবৎসর হলো ধনু, কালরাত্রি হলো জ্যা। বিষ্ণু, অগ্নি, চন্দ্র বাণ হলেন। ব্রহ্মা হলেন সারথি। এরপর ত্রিপুর অভিমুখে যাত্রা করা হলো। পথে বিষ্ণু, অগ্নি, চন্দ্র, ব্রহ্মা ও রুদ্রের ভারে রথের চাকা মাটিতে বসে গেল। তখন বিষ্ণু বাণ থেকে বেরিয়ে বৃষরূপে

মাটিতে বসে যাওয়া রথ উঠিয়ে দিলেন। মহাদেব তখন বৃষরূপী নারায়ণ ও অশ্বের পিঠে পা রেখে ধনুতে জ্যা লাগিয়ে তাতে পাশুপত অস্ত্র লাগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এই সময় দানবদের তারাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালীর তিনপুর (নগর) এক হয়ে যাওয়ায় (docked) মহাদেব পাশুপত বাণ মেরে ত্রিপুরকে দগ্ধ করে পশ্চিম সমুদ্রে ফেলে দিলেন। এজন্য মহাদেবের নাম হলো ত্রিপুরারি। রুদ্র ক্রুদ্ধ হলে ধ্বংস করেন আর সন্তুষ্ট হলে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আবার তিনি রোগও দূর করেন। তিনি একাধারে তাই রুদ্র অর্থাৎ ভয়ানক, আবার শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

মহাদেবকে মহাকালও বলা হয়। কারণ তিনি সর্বসংহারক। আবার তার থেকেই অভ্যুদয় হয়। সেজন্য তিনি শিব ও শঙ্কর নামে জননশক্তি।

যা ধ্বংস হচ্ছে তাই আবার জন্মাচ্ছে। তাই মহাদেব ঈশ্বরও অর্থাৎ সর্বশক্তিমান মহাদেব। ভৈরবও তিনি। আবার তিনিই মহাযোগী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী— কঠোর তপস্যা ও ধ্যানের প্রতীকস্বরূপ।

মহাদেব সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা, গন্ধর্ব এবং প্রমথগণ পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন। মহাদেবের বাসস্থান কৈলাস। কুবের তাঁর ধনরক্ষক। পার্বতী তাঁর স্ত্রী। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী তাঁর পুত্রকন্যা। মহাদেব শ্মশানে সর্পজড়িত মস্তকে কঙ্কাল মালা ভূষিত হয়ে বাস করেন। *মহাদেবের ধ্বংসকারী নাচকে তাণ্ডব বলে।*

"নাচে পাগলা ভোলা বাজে বম্ বম্ বম্;
শিঙা বাজিছে ভোঁ ভোঁ ভম্ ভম্ ভম্।।"

—স্বামী তপানন্দ

গজাসুর ও কালাসুর নিধন করেও মহাদেব তাণ্ডবনৃত্য নেচেছিলেন। তিনি আবার নৃত্যকলারও উদ্ভাবক। তাই তিনি নটরাজ। তাঁর দিকে তাকালে আমরা দেখব— তাঁর ললাটে ত্রিনয়ন। তার উপরে অর্ধচন্দ্র, মাথায় জটা। পরনে ব্যাঘ্রচর্ম। উত্তরীয় কৃষ্ণসার মৃগচর্ম, গলায় সাপের উপবীত। হাতে ডমরু, দুর্গতদের শান্তির জন্য গদা। তাঁর বাহন নন্দী। মহাদেব মহর্ষি অত্রির কাছে যোগশিক্ষা করেছিলেন। মঙ্গলকাব্যে মহাদেব তথা শিবের অসংখ্য কাহিনি আছে। অন্নদামঙ্গলে ঈশ্বর পাটনির সঙ্গে অন্নদার কথোপকথন যদিও বাজস্তুতি অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে তথাপি আধ্যাত্মিক সাহিত্য পাঠক মাত্রই এই অলঙ্কার প্রয়োগ শিবের মাহাত্ম্য বলেই আনন্দ পান— 'ঈশ্বরীকে যখন ঈশ্বরী (ভগবতী) বলেন— 'অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ। কোনো গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন'— এই বৃদ্ধ পতিটি যে শিব তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর গাত্রবরণ ধোঁয়াটে বা ধূম্রবর্ণ বলে তাঁকে ধূর্জটি বলা হয়। মানুষের মঙ্গল কামনা করে তাদের উন্নত করেন বলে তাঁকে শিব বলা হয়। সকল পশুদের অধিপতি ও পালনকর্তা বলে পশুপতি বলা হয়। শব বা শিবের বাসস্থান শ্মশান। কেন? —ইহকালের বা ইহজন্মের কর্মফল ভোগান্তে জীবের শেষ বিশ্রামস্থান। শ্মশানই শবের বা শিবের শয়নস্থান। তাই শ্মশানেই কালী (kinetic energy) স্থিরভাবে বাস করেন। শুধু জীবনেরই শেষে নয়, কল্পান্তেও তাঁর আশ্রয়ে সকলে বিশ্রাম পায়। ব্রহ্মপুরুষ শিব কালীর পদতলে কেন? "কালী যেমন শিবের অধীন, শিবও তেমনি কালীর অধীন। শিব হলেন পুরুষ (Potential Energy of this Universe) এবং কালী হলেন প্রকৃতি (Kinetic Energy of this Universe) (কথামৃত চেতনা ৩৫ পৃ.)। শিবরাত্রি ব্রতকথায় আছে মাতা পার্বতী কৈলাস পর্বতে শিবকে জিজ্ঞেস করলেন--- "হে ভগবান! আপনার সন্তোষই মানুষের ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষলাভের কারণ। মানুষ কী তপস্যা, ব্রত অথবা কী কর্ম করলে আপনি সন্তোষ লাভ করেন?" ভুবনমোহিনী হাসি হেসে ভগবান শঙ্কর বললেন— "হে প্রিয়ে! ফাল্গুনমাসের ঘোর অন্ধকার চতুর্দশীর রাত্রিটির নাম শিবরাত্রি। তাই রাত্রিতে উপবাস করে মানুষ আমার কৃপা সর্বাধিক লাভ করবে। স্নান, মন্ত্র, জপ, পূজা, ধ্যানের চাইতেও শিবরাত্রির উপবাসে আমি সর্বাধিক প্রসন্নতা লাভ করি।

নিয়ম : শিবরাত্রি পূর্বদিনে ত্রয়োদশীতে একবার মাত্র স্নান করে নিরামিষান্ন বা হবিষ্যান্ন ভোজন করে তৃণশয্যায় শয়ন করবে। প্রভাতে জাগরণের পর আবশ্যকীয় নিত্যক্রিয়াদি শেষ করে বিল্বপত্র চয়ন করবে। শিবপূজাতে সকল বস্তু অপেক্ষা বিল্বপত্রই শ্রেয়। বিল্বপত্র দ্বারা পূজায় আমি যেরূপ প্রীতিলাভ করি, মণি, মুক্তা, প্রবাল, হিরা, স্বর্ণ ও পুষ্পাদিতে তত প্রীত হই না। দুগ্ধাদি দ্বারা প্রহরে প্রহরে স্নান করিয়ে গন্ধাদি দ্বারা আমার পূজা করতে হবে। প্রথম প্রহরে দুগ্ধ, দ্বিতীয় প্রহরে দধি, তৃতীয় প্রহরে ঘৃত এবং চতুর্থ প্রহরে মধুর দ্বারা আমাকে স্নান করাবে। মূলমন্ত্র দ্বারা যথাশক্তি পূজা এবং নৃত্যগীতাদি দ্বারা রাত্রি জাগরণ করবে। পরের দিন আমার ভক্ত 'ব্রতী' ব্রাহ্মণগণকে পূজা- ভোজন করিয়ে পারণ করবে। হে দেবী ভগবতী! এই পূজা ব্রত দ্বারা আমার অত্যন্ত প্রীতি হয়। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা সহকারে মানুষ এই ব্রতের কিয়দংশ ফলও লাভ করতে পারে না।"

আমরা তার কাছে প্রার্থনা করি— এই জন্মে হস্তপদদ্বারা কৃত অপরাধ, বাক্যজ, শরীরজ, কর্মজ, শ্রবনজ, নয়নজ কিংবা মানস অপরাধ অথবা জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত অপরাধ সকলই তুমি ক্ষমা কর। হে করুণাসাগর শ্রী মহাদেব শম্ভু, তোমার জয় হউক, তোমার জয় হউক, জয় হউক।

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বংগতি পরমেশ্বর।।

(সৌজন্যে দৈনিক সংবাদ)

দক্ষিণবঙ্গ সংস্কার ভারতীর ধরোহর যাত্রা

ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সংস্কার ভারতী কাজ করে চলেছে। তারই অঙ্গ হিসেবে ২০১৯-২০ বর্ষে প্রত্নতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবেত্তা, চিত্রকর তথা সংস্কার ভারতীর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক পদ্মশ্রী ড. বিষ্ণু শ্রীধর বাকনকরজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ঐতিহ্যের খোঁজে ভারতবর্ষ জুড়ে চলছে 'ধরোহর যাত্রা'। তারই অঙ্গ হিসেবে সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের ধরোহর যাত্রা কলকাতা মণ্ডলের ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সহযোগিতায় গত ১৯ জানুয়ারি হুগলী জেলার হংসেশ্বরী শিবমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় ব্যান্ডেল শাখার আয়োজনে সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে 'শ্রী' অঙ্কিত প্ল্যাকার্ড হাতে এবং পিছনে চতুর্দোলায় মঙ্গল কলস ও নটরাজ মূর্তি সহ শঙ্খধ্বনি সহযোগে সদস্যরা পথ পরিক্রমা করেন। সঙ্গে ছিল 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরই অপমান' সমবেত গীত এবং ছোটোদের নৃত্যের তালে তালে শিববন্দনা। মন্দির প্রাঙ্গণে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় সমবেত ভাব সংগীত ও শিশুশিল্পীদের গৌড়ীয় নৃত্যাঙ্গিকে গণেশ বন্দনার মধ্যে দিয়ে। প্রাচীনকালের গুরু-শিষ্য পরম্পরা অনুসারে মঞ্চের সামনে আসন-চৌকি পেতে দোয়াত-কলম হাতে বসে রয়েছে শিশুরা। মঞ্চে উপবিষ্ট কলকাতা মণ্ডলের পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের অধিকর্তা ড. শুভ মজুমদার, ড. বিষ্ণু শ্রীধর বাকনকর জন্মশতবার্ষিকী কমিটির সদস্য তথা সংস্থার সর্বভারতীয় সম্পাদিকা শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়, দক্ষিণবঙ্গের পর্যবেক্ষক বলরাম দাসরায়, সাধারণ সম্পাদক ভরত কুণ্ডু, প্রদেশ জন্মশতবার্ষিকী কমিটির সংযোজক অমিতাভ মুখোপাধ্যায় এবং হংসেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত তথা সেবক বসন্ত চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত ও প্রান্ত সংগঠন অধিকারী উদয় দাস। শ্রীমতী রায় ড. বাকনকরজীর কর্মজীবন এবং ভারতবর্ষের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর ভীমবেটকা গুহা আবিষ্কার ও বৈদিক নদী সরস্বতীর গতিপথ খুঁজে বের করার কথা উল্লেখ করেন। ড. মজুমদার বলেন, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, তার সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি সংস্কার ভারতীর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির সহায়ক এরকম অনুষ্ঠান আরও হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ব্যান্ডেল শাখার সম্পাদিকা গৌরী সেনগুপ্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ সরকার, শৈবাল সেনগুপ্ত ও নীহাররঞ্জন সেন। অনুষ্ঠানে ১২৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

মালদহে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে সামুহিক বিবাহ অনুষ্ঠান

গত ২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্মপ্রসার বিভাগের উদ্যোগে মালদহ জেলার আটমাইল আলুহাট প্রাঙ্গণে সামুহিক বিবাহের আয়োজন করা হয়। সাধারণ সমাজ ও বনবাসী সমাজের ১৩৩ দম্পতির প্রচলিত রীতি মেনে পেড়ে শাড়ি পরে কলসযাত্রায় অংশ নেয়। পুরোহিত ও মোড়ল হিসেবে মন্ত্র উচ্চারণ করে বিবাহ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন গঙ্গা মুর্মু। উপস্থিত ছিলেন ধর্মপ্রসার বিভাগের কেন্দ্রীয় সম্পাদক অচ্যুতানন্দ কর, জেলা সভাপতি

অনুষ্ঠানে ছ'হাজার মানুষ সহভাজে অংশগ্রহণ করেন। সবাই বর-বধূদের আশীর্বাদ ও উপহার প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠান চলাকালীন স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতী গণ্ডগোল সৃষ্টি করার চেষ্টা করে।

স্থানীয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামীজী মহারাজের নেতৃত্বে বৈদিক যজ্ঞ ও মন্ত্র-সহকারে মহা ধুমধামে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কয়েক হাজার বনবাসী মহিলা লাল

মলয় মুখার্জি, জেলা সম্পাদক অসিত কুমার সরকার, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনুপ কুমার মণ্ডল, উত্তরবঙ্গ প্রান্তের ধর্মপ্রসার প্রমুখ মন্টু সরকার।

পুলিশি তৎপরতায় তারা পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের নামে মামলা দায়ের করে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, শাসকদলের প্ররোচনায় পুলিশ এসব করছে।

বক্রেশ্বরে ভারতীয় ডাক কর্মচারী সঙ্ঘের রাজ্য সম্মেলন

গত ২৫-২৫ জানুয়ারি ভারতীয় ডাক কর্মচারী সঙ্ঘ, তৃতীয় শ্রেণী, পশ্চিমবঙ্গ শাখার ১৬ তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর ধামে। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শিবমন্দির থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথপরিক্রমা করে আসানকুলি গ্রামের ফুটবল মাঠে শেষ হয়। সেখানে দুটি ফুটবল দলকে একটি করে ফুটবল দেওয়া হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে সম্মেলনের সূচনা করেন স্বামী জগদানন্দ মহারাজ। সংস্থার পতাকা উত্তোলন করেন বিএমএসের সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল মুখার্জি। সভাপতিত্ব করেন আইআইএম শিলঙের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিল্পপতি শিশির বাজোরিয়া। দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর কর্ম ও জীবন সম্পর্ক বক্তব্য রাখেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ধনপত আগরওয়াল , রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বীরভূম বিভাগ প্রচারক উত্তম মণ্ডল এবং বিএমএসের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক গণেশ মিশ্র। ভারতীয় ডাক কর্মচারী সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মহাবীর সিংহ চান্দেল এবং ভারতীয় গ্রামীণ ডাক কর্মচারী সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুগন্ধি কুমার মিশ্র সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। রাজ্য সম্পাদক জয়নাথ চৌবে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের রীতিনীতি বিষয়ে আলোকপাত করেন। পোস্টম্যান ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক পাঁচুগোপাল রাজমল্ল নতুন কমিটি ঘোষণা করেন। রাজ্য সভাপতি ও রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে শ্যামসুন্দর শীল ও স্বর্ণেন্দু চক্রবর্তী। সম্মলনে সাংগঠনিক ২১টি জেলার ১৭৮ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন ভারতীয় ডাক কর্মচারী সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সম্পাদক অনন্ত পাল।

জি এস আই ই এস-এর সর্বভারতীয় আঞ্চলিক সম্মেলন

গত ২২ জানুয়ারি জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ সঙ্ঘের তৃতীয় সর্বভারতীয় আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা কিড স্ট্রিটের ড. বি আর আম্বেদকর হলে। সকাল সাড়ে দশটায় সংস্থার ইউনিট প্রেসিডেন্ট সুধাকর রাও ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের পতাকা উত্তোলন করে সম্মেলনের শুভারম্ভ করেন। উপস্থিত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে সংস্থার সম্পাদক সঞ্জয় চৌধুরী বিগত দু'বছরের প্রতিবেদন পাঠ করেন। এই অধিবেশনে রাজ্য বিএমএসের পক্ষ থেকে বিশেষ অতিথি ও প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন অশোক কুমার সাউ ও চন্দ্রচূড় গোস্বামী। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীগোস্বামী ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের সৃষ্টি, তার লক্ষ্য, অতীত ক্রমান্বয়ে সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজবাদ, তথাকথিত সাম্যবাদ (কমিউনিজম্) এবং মিশ্র অর্থনীতির বিভিন্ন দিক ও ব্যর্থতার ইতিহাস তুলে ধরে বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করেন। দ্বিতীয় তথা প্রকাশ্য অধিবেশনে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাদের কর্মসূচি ও দাবিদাওয়া তুলে ধরেন। এরপর বিশেষ অতিথি শ্রীসাউ নবগঠিত সমিতির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। সমাপ্তি ভাষণে শ্রীগোস্বামী ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যা ও নানান প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আহ্বান জানান শ্রমিক স্বার্থে নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য ভুলে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করার।

শ্রমণ শিল্পীদলের পঞ্চম প্রদর্শনী

শ্রমণ শিল্পীদল তাদের যাত্রা শুরু করেছিল তিনবছর আগ২০১৭ সালে। সম্প্রতি সুব্রত রায়চৌধুরীর পরিচালনায় স্টার থিয়েটারের নটি বিনোদিনী আর্ট গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয় তাদের পঞ্চম দলগত প্রদর্শনী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী বাদল পাল, প্রদীপ মৈত্র, আলোকচিত্রী বিশ্বতোষ সেনগুপ্ত, গ্রন্থাগারিক সন্দীপ দত্ত ও বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী শান্তনু রায়চৌধুরী। তিনজন আলোকচিত্র শিল্পী ও ৫৪ জন চিত্রশিল্পী এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। জল রং, তেল রং, অ্যাক্রিলিক ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমের কাজ প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। ১২ টি আলোকচিত্র, ১২০টি চিত্রকর্ম ও ৫ টি ভাস্কর্য দিয়ে সাজানো হয়েছিল এবারের প্রদর্শনী। বিষয় ভাবনা ও উপস্থাপনায় প্রত্যেক শিল্পী মুনশিয়ানার ছাপ রেখেছেন। তবে বিশেষভাবে নজর কেড়েছেন সৌমেন্দ্র আকুলি, মলয় চন্দন সাহা, প্রশান্ত বসু, প্রদীপ মৈত্র (ছোট), সুব্রত রায়চৌধুরী, দীপক বর্মন, পি কাশ্যপ, অনসূয়া চক্রবর্তী, স্বপন গুপ্ত প্রমুখ। প্রদর্শনীর সঙ্গে বাঁশির মেঠো সুর অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ও শান্তির আবহ সৃষ্টি করেছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ প্রতিযোগিতায় বিদ্যানগর কলেজের সর্বোচ্চ সম্মান

গত ৬ ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোয়িং ক্লাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ডায়মন্ড হারবারের বিদ্যানগর কলেজ সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়। এই কলেজের দুই ছাত্র প্রীতম জানা ও সুশোভন বেরা এবং এক ছাত্রী প্রীতি দাস সর্বোচ্চ প্রতিযোগীর সম্মান লাভ করেন। উল্লেখ্য, এরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ দলের হয়ে গত ৬ থেকে ১০ জানুয়ারি অন্ধ্রপ্রদেশের রাজীব গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় যোগ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া বিদ্যানগর কলেজের দুই প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী— অরূপ বাগ ও শ্রাবন্তী মাখাল যাঁরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগের ওপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করছেন তারাও সর্বভারতীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় যোগ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

সার্ধশতবর্ষ অতিক্রম করল
উত্তরদিনাজপুরের চূড়ামণ উচ্চ বিদ্যালয়

ড. বৃন্দাবন ঘোষ

বাঙ্গলার জমিদাররা ভোগবিলাসিতায়, দানধ্যানে, শিক্ষায়, পূজাপার্বণে, মন্দির প্রতিষ্ঠায় পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করতেন। উত্তরদিনাজপুর জেলার চূড়ামণের জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর এলাকার অধিবাসীদের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে জমিদারবাড়িতে ১৯৬৪ সালে চূড়ামণ মিডিল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বিংশ শতকের প্রথম দিকে মহানন্দার বিধ্বংসী বন্যায় জমিদারবাড়ি ভেঙে পড়ে। তখন বর্তমান স্কুল প্রাঙ্গণে ইটের দেওয়াল ও টিনের ছাউনি দিয়ে দক্ষিণমুখী দুটি লালরঙের ঘর তৈরি করা হয়েছিল। তখন কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরীর নামে এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছিল কে. সি. ইন্সটিটিউশন। সেখানে প্রথম থেকে ষষ্ঠশ্রেণী পর্যন্ত খুব যত্ন সহকারে পড়ানো হতো। ভারত বন্ধু পাট্টাদার, যশোদা নন্দন চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মজুমদার, কামনানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বলরাম দত্ত, হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিক্ষক পাঠ দান করতেন। ইটাহার, গুলন্দর, মারনাই, খরবা, চাঁচোল প্রভৃতি এলাকায় কোনো বিদ্যালয় ছিল না। ফলে সেসব এলাকা থেকে বহু ছাত্র-ছাত্রী পড়তে আসত। অশ্বিনী কুমার দাস ষষ্ঠ শ্রেণীর পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করে।

সেখানে মেয়েদের জন্যও একটি পৃথক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। জমিদাররা এই দুটি স্কুলই পরিচালনা করতেন এবং শিক্ষকের বেতনও দিতেন। দুর্গাময়ী রায়চৌধুরী চূড়ামণ থেকে ছেলে ভূপালচন্দ্র রায়চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে ভূপালপুরে চলে আসেন। তখন থেকে তাঁরা এই বিদ্যালয় পরিচালনা ও ব্যয়ভার বহনে নিরুৎসাহ বোধ করেন। মেয়েদের স্কুলটিরও পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু স্থানীয় কিছু মানুষ ছেলেদের এই স্কুলে পঠনপাঠন ধরে রাখার জন্য ১৯৫৩ সালে জুনিয়ার হাইস্কুল শুরু করে। ১৯৬৪ সালের ৩ আগস্ট এই স্কুল ফোর ক্লাস জুনিয়র স্কুলের (মেমো নং-২০২৪৮/জি, ডেটেট ০৩.০৮.৬৪) অনুমোদন লাভ করে।

স্থানীয় মানুষজনের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে হায়ার সেকেন্ডারি করার জন্য খড়ের ছাউনি দেওয়া কয়েকটি বড়ো ঘর বর্তমান স্কুল প্রাঙ্গণে তৈরি করা হয়। ওই সময়ে নাকি আগুনে ঘরগুলি পুড়ে যায়। তখন স্কুলের প্রয়োজনীয় বহু মূল্যবান কাগজপত্রও পুড়ে যায়। পুরুষোত্তমপুরের রামজীবন সরকার স্কুলের রিজার্ভ ফান্ডের জন্য দশ হাজার টাকা দান করেন। তাই তাঁকে এই বিদ্যালয়ের আজীবন সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়। তাছাড়াও তাঁর বাবা প্রহ্লাদ চন্দ্রের নামে এই স্কুলের নামকরণ (চূড়ামণ পি.সি. হাইস্কুল) করা হয়।

১৯৬৭ সালে এই স্কুল এগারো ক্লাস হায়ার সেকেন্ডারির অনুমোদন (মেমো নং-১৬৩৫৬/জি, ডেটেট ২০.০৬.১৯৬৭) লাভ করে। তখন এই বিদ্যালয়ে ২০০ থেকে ২৫০ জন ছাত্র পড়াশোনা করতো। দূরদূরান্তের ছাত্ররা হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করতো। তপেশ চন্দ্র লাহিড়ী, নান্টু ভট্টাচার্য, হাবু সরকার, পূর্ণচন্দ্র দাস, গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র চক্রবর্তী, কালু মহম্মদ, আফাজুদ্দিন আহমেদ,

সত্যেন্দ্র কুমার রায়, অঞ্জলি ভট্টাচার্য প্রমুখ শিক্ষক শিক্ষিকা পাঠদান করতেন। তাঁরা অনেকে বিদ্যালয়ের স্টাফ কোয়াটারে থাকতেন এবং ছাত্রদের লেখাপড়ার সহযোগিতা করতেন। ১৯৬৯ সালে হায়ার সেকেন্ডারির প্রথম পাঁচজন ছাত্র পরীক্ষা দেয় এবং দুজন পাশ করে।

১৯৭৩ সালে এই বিদ্যালয় কো-এডুকেশনের অনুমোদন (মেমো নং-১৬/৭৩ ডেটেট ০৩.১২.৭৩) পায়। ১৯৭৬ সালে এই বিদ্যালয় থেকে ৬২ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দেয় এবং তার মধ্যে মোট চারজন পাশ করে। প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১৯৭৯ সালে গোপাল চন্দ্র প্রথম বিভাগে এবং ১৯৯৯ সালে হোসনেয়ারা খাতুন প্রথম স্টার মার্কস্ নিয়ে পাশ করে। ২০১২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কলা বিভাগে রেজিনা খাতুন ৪১২ নম্বর পেয়ে ইটাহার ব্লকে প্রথম স্থান অধিকার করে।

প্রধান শিক্ষক আশিস কুমার মজুমদারের উদ্যোগে এই স্কুল ২০০০ সালে হায়ার সেকেন্ডারি (মেমো নং-ডি.এস (এ) এস.ডি/১৫৫৭/ রেকগ/২০০০, ডেটেট ২০,০৭.২০০০) এবং ২০০৬ সালের ১৮ আগস্ট ভোকেশনাল কোর্সের অনুমোদন লাভ করে। ২০১২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই বিদ্যালয় থেকে কল্যাণ দাস প্রথম স্টার মার্কস্ নিয়ে পাশ করে।

বিভিন্ন সময়ে এই বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সম্পাদকের পদে সুশীল কুমার ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্রনাথ সাহা, বিষ্ণুপদ দাস, জামাইত সরকার, রামজীবন সরকার, অবনীভূষণ দাস, বিভূতিভূষণ দাস, মঙ্গলচন্দ্র দাস, নিবাস ব্যানার্জি, রঘুনন্দন দাস, কার্তিক চন্দ্র দাস, উজ্জ্বল দাস নির্বাচিত হন এবং প্রেসিডেন্টের পদে শুভাশিস সরকার, যতীন্দ্রনাথ বর্মন মনোনীত হন। বিভিন্ন সময়ে ভারতবন্ধু পাট্টদার, যশোদানন্দন চ্যাটার্জি, বিভূতিভূষণ মজুমদার, অনন্তলাল দাশগুপ্ত ও তপেশ চন্দ্র লাহিড়ী প্রধান শিক্ষকের, রাজীব লোচন সরকার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের, আশিস কুমার মজুমদার প্রধান শিক্ষকের এবং তাপস বড়াল ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের পদে আসীন হন।

এঁদের উদ্যোগে এবং সরকারের আর্থিক অনুদানে সাড়ে তিন একর জায়গায় বিদ্যালয়ের দ্বিতল বাড়িঘর, সাংস্কৃতিক মঞ্চ এবং মূল প্রবেশপথ গড়ে ওঠে। দক্ষিণ দিকে একেবারে স্কুল সংলগ্ন মহানন্দার তীরে ছিল নীলকর সাহেবদের নীলকুঠি। এক সময় সেখানে উৎকৃষ্ট মানের নীল উৎপাদন হতো। ইতিহাস প্রসিদ্ধ নদীবক্ষের সবুজ উন্মুক্ত প্রকৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠগ্রহণে অনাবিল আনন্দ দান করে থাকে।

২০১২-২০১৩ সালে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৮৫৩ জন। ২০১৯ সাল থেকে তার সংখ্যা ১৬০৯ জন এবং ত্রিশ জন স্থায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকা, পাঁচ জন পার্শ্ব শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং দশ জন আংশিক সময়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা পাঠদানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা আশি ভাগ মুসলমান, হিন্দুদের মধ্যে বারো ভাগ তপশিলি এবং আট ভাগ সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রচুর তপশিলি উপজাতির গরিব ঘরের ছেলে-মেয়ে এই বিদ্যালয়ের পড়াশুনা করে। চূড়ামণ, বাসুদেবপুর, গৌরীপুর, পুরুষোত্তমপুর, গোপীনাথপুর, দৌলি দেউল চক, পাতনোলিয়া, মানাইনগর, চন্দনপুর, নধাপাড়া, রামনগর, রাধানগর, কামারডাঙ্গা, টিটিহি, জামালপুর প্রভৃতি এলাকা থেকে ছেলে-মেয়েরা নীল সাদা রঙের পোশাক পরে বিদ্যালয়ে আসে। স্বাধীনতা সংগ্রামী বামাপদ আচার্য এবং পণ্ডিত সীতানাথ আচার্যও এই বিদ্যালয় থেকে পাঠগ্রহণ করেন।

২০০১ সালে বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিনয়কুমার মল্লিকের সম্পাদনায় মহানন্দা নামে একটি দেওয়াল পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু তিনটি সংখ্যা প্রকাশ হবার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা জেলাস্তরের আবৃত্তি, প্রবন্ধ, বিতর্ক, সংগীত প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে থাকে। তারা পাঁচ ছয় বছর ধরে ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসে রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সুনাম অর্জন করে চলেছে। বিদ্যালায়ের ছাত্রী পারমিতা দাস নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির রাজ্যস্তরের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা যোগ দিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

বিদ্যালয়ের অনতিদূরে চূড়ামণ জমিদারবাড়ির সামনে রয়েছে তিন একর জায়গা জুড়ে বিদ্যালয়ের নিজস্ব খেলার মাঠ। জমিদারি আমলে জমিদারদের উদ্যোগে এই মাঠে ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসতো। আর সেই প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর চূড়ামণ গুলন্দরের মুখোমুখি হতো বিশেষ করে তাদের এই দুই দলের খেলা দেখার জন্য এই এলাকার বহু মানুষের সমাগম হতো। প্রধান শিক্ষক তপেশচন্দ্র লাহিড়ী খুব ভালো ফুটবল খেলতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সেখানে তিনি ফুটবল খেলতে উৎসাহিত করতেন। প্রধান শিক্ষক আশিসকুমার মজুমদার ও সহ শিক্ষক রমেন্দুদেব সরকার বানবোল হাইস্কুলের ক্যারাম প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে ব্লক চ্যাম্পিয়নের শিরোপা লাভ করেন।

২০১৫ সালে এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়ের সার্ধশতবর্ষ উৎসব পালিত হয়। এই উৎসব শুরু করার ব্যাপারে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের শিশু ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচির জেলা সমন্বয়ক ক্ষিতীশ সরকার এবং এই প্রতিবেদকও সহযোগিতা করেন। এই বিদ্যালয় উত্তর দিনাজপুর জেলার সবচেয়ে পুরনো প্রতিষ্ঠান। বহু ব্রিটিশ পরিদর্শক এই স্কুল পরিদর্শন করেন। দেড়শো বছরের নানান স্মৃতি বিজড়িত ঘটনা এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, যা আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার সহায়ক। সেদিক থেকে এই উচ্চ বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এই প্রতিবেদক ওই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়কে হেরিটেজের স্বীকৃতি দানের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানায়। ■

হিন্দুবীর সম্রাট হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্য

প্রণব দত্ত মজুমদার

স্কুলপাঠ্য কোনও ইতিহাস বইয়ে দেখা যাবে মুঘল বাদশা আকবর ১৫৫৬ সালে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে আফগান বাহিনীর সেনাপতি হেমু বা হিমুকে হারিয়ে দিল্লির মসনদে বসেন। হেমু সম্পর্কে আমাদের দেশের সেকুলার ঐতিহাসিকরা স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে একটা বাক্যের থেকে বেশি কিছু লেখার প্রয়োজন বোধ করেননি। অথচ তাঁরা আফগান, পাঠান, মুঘলের ইতিহাস লিখে পাতার পর পাতা ভরিয়ে দিয়েছেন।

হিমু এমন এক হিন্দু বীর ছিলেন যিনি কোনও রাজা, আমাত্য, সেনাপতির ছেলে ছিলেন না। এক সাধারণ পরিবারের ছেলে হয়ে স্বীয় শক্তি-বুদ্ধি-প্রতিভার জোরে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুসলমান শাসকদের আমলে ভারতের একটি বৃহৎ অংশের শাসক হয়ে দিল্লির সিংহাসনে বসেছিলেন। সেকুলার ঐতিহাসিকরা এই অভূতপূর্ব অসাধারণ হিন্দু বীরের ইতিহাস আশ্চর্যরকম ভাবে পাশ কাটিয়ে গেছেন। তাঁর পুরো নামটা পর্যন্ত স্কুলপাঠ্য কোনও ইতিহাস বইয়ে লেখা হয়নি। হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্য মতান্তরে বিক্রমাদিত্য হেমরাজকে এত অবহেলার কারণ কী? প্রখ্যাত ঐতিহসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

হিমুর নাম আসলে হেমচন্দ্র। অসাধারণ বুদ্ধি শক্তি ও কর্মদক্ষতার অধিকারী হেমচন্দ্রের আশ্চর্য উত্থান সেই সময়ে যখন ভারতের দখলদারি নিয়ে আফগান আর মুঘল শাকদের মধ্যে ঘোরতর লড়াই চলছে। ভারতে মুঘল শাসনের পত্তন করেছিলেন জাহিরউদ্দিন বাবর ১৫২৬ সালে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে হারিয়ে। ১৫৩০ সালে বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে নাসির-উদ্দিন মহম্মদ হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে বসেন। কিন্তু আফগান শাসক শের শাহ সুরি (শের খান)

তাঁকে পরাজিত করে দিল্লি আগ্রা দখল করে দিল্লির মসনদে বসেন ১৫৪০ সালে। হুমায়ুন পালিয়ে প্রথমে লাহোর, তারপর পারস্যে চলে যান। ১৫৪৫ সালে শের শাহ মারা গেলে তাঁর মেজো ছেলে জালাল খাঁ সুলতান হয়ে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। নাম গ্রহণ করেন ইসলাম শাহ।

ইসলাম শাহের আমলেই হেমচন্দ্র বা হিমুর উত্থান। হিমু ছিলেন আলোয়ার অঞ্চলের এক সাধারণ হিন্দু পরিবারের ছেলে। তাঁর জন্ম ১৫০১ সালে। পিতার নাম ছিল পূর্ণদাস রাই। জানা যায়, তিনি একজন সবজি বিক্রেতা ছিলেন এবং বাজারের ওজন সংক্রান্ত ব্যপারে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। যেভাবেই হোক তিনি সুলতান ইসলাম শাহের নজরে পড়ে যান। ইসলাম শাহ হেমুকে দিল্লির বাজার অধিকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেন। হেমু স্বীয় বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার ফলে সুলতান ইসলাম শাহের সুনজরে পড়েন এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর পদে নিযুক্ত হতে থাকেন। সুলতান তাঁর এই বুদ্ধিমান, কর্মঠ ও বিশ্বস্ত কর্মচারীটিকে দারোগা-ই-ডাকচৌকি (বা ডাক বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তা) পদে উন্নীত করেন। তাঁর সততার কারণে তাঁকে গুপ্তচর বিভাগের প্রধান হিসেবেও নিযুক্ত করেন। ঐতিহাসিক আহম্মদ ইয়াদগার তাঁর 'তারিখ-ই-সালাদিন-ই- আফগানা'য় তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। সুলতান ইসলাম শাহের আমলে হেমচন্দ্র বা হিমু অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে ওঠেন এবং সুলতানের নানারকম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদের দায়িত্বভার সুনিপুণভাবে পরিচালনা করেন।

সুলতান ইসলাম শাহের পর তাঁর নাবালক ছেলে ফিরুজকে সুলতান বলে ঘোষণা করা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই ফিরুজের মামা মুবারিজ খাঁ ফিরুজকে হত্যা করে আদিল শাহ নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে বসেন। ইসলাম শাহর প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে হত্যা করে আদিল শাহ সুলতান হয়েছিলেন বলে ইসলাম শাহর অনুগত আমির-ওমরাহদের মনে ক্ষোভ ছিল। আদিল শাহ প্রচুর ধনদৌলত উপঢৌকন দিয়ে তাঁদের কোনওরকমে হাত করেছিলেন বটে কিন্তু তাঁদের উপর পুরো আস্থা তাঁর ছিল না। আদিল শাহ দক্ষ প্রশাসক ছিলেন না; বরঞ্চ তিনি আমোদপ্রমোদে ডুবে থাকতে ভালোবাসতেন। এই সময় থেকে ভারতে আফগান শাসনের ভিত দুর্বল হতে থাকে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মহম্মদ আদিল শাহ সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল ছিলেন হেমচন্দ্র বা হিমু ওপর। সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ হিমুকে তাঁর প্রধান আমাত্য (উজির) নিযুক্ত করেন এবং বলতে গেলে প্রশাসনিক, সামরিক, আর্থিক ইত্যাদি প্রায় সমস্ত দায়িত্বই তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই সুলতান আদিল শাহ তাঁর মুসলমান আমির-ওমরাহদের মধ্যে এরকম বুদ্ধিমান, দক্ষ ও বিশ্বস্ত কাউকে খুঁজে পাননি। আদিল শাহর দুর্বলতার সুযোগে আফগান শাসকরা বিদ্রোহ আরম্ভ করলেন। সেই সময় জুনাইদ খাঁ ছিলেন বায়ানার শাসনকর্তা এবং তাঁর ছেলে আজমিরের ফৌজদার। সুযোগ বুঝে বাপ

ছেলে মিলে বিদ্রোহ আরম্ভ করেন। আদিল শাহ প্রথমে তাঁর অধীনে গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা জামাল খাঁ-কে প্রেরণ করলেন জুনাইদ খাঁকে দমন করার জন্য। জামাল যুদ্ধে পরাজিত হন। এগিয়ে আসেন হিমু। তিনি সুলতানকে অনুরোধ করেন তাঁকে যুদ্ধের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। তিনি বলেন তাঁকে যদি দায়িত্ব দেওয়া হয় তবে হয় তিনি জুনাইদকে পরাজিত করবেন না হয় যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করবেন।

সুলতান আশ্বস্ত হয়ে তাঁকে ৪টি হাতি-সহ চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে যুদ্ধে পাঠালেন। হিমু বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কৌশলী আক্রমণ করে জুনাইদকে পরাস্ত করেন। বিজয়ী হিমু সুলতান আদিল শাহর দরবারে উপস্থিত হলে সুলতান তাঁকে দামি দামি উপহার প্রদান করেন। হিমু বিনীত ভাবে বলেন— সুলতানের ভাগ্য আর সৈনিকদের বীরত্বের জন্যই এই যুদ্ধ জয় সম্ভব হয়েছে, তাঁর কৃতিত্ব এমন কিছু নয়। সুলতান তাঁর এই বিনয়ে মোহিত হয়ে গেলেন।

এরপর সুলতান আদিল শাহ হিমুকে বিদ্রোহী ইব্রাহিম খাঁকে দমন করতে পাঠালেন। হিমু ইব্রাহিম খাঁকে দুবার যুদ্ধে পরাস্ত করেন। একবার কাল্পিতে, আরেকবার খানুয়ায়। ইব্রাহিম খাঁ প্রাণ বাঁচাতে বায়ানা দুর্গে পালিয়ে যান। হিমু প্রায় তিন মাস ধরে বায়ানা দুর্গ অবরোধ করে রাখেন।

এইসময় সুলতান আদিল শাহ কাল্পিতে অবস্থান করেন। তিনি খবর পেলেন বাঙ্গলার বিদ্রোহী শাসনকর্তা মহম্মদ শাহ তাঁর বাহিনী নিয়ে কাল্পির দিকে এগিয়ে আসছে। তৎক্ষণাৎ তিনি হিমুকে কাল্পিতে ডেকে পাঠালেন। ফলে হিমুকে বায়ানা দুর্গের অবরোধ তুলে কাল্পিতে ফিরে আসতে হয়। তিনি মহম্মদ শাহর বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। কাল্পি থেকে ২০ মাইল দূরে মহম্মদ শাহর সঙ্গে তাঁর তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হিমু জয়লাভ করেন। বাঙ্গলা আবার আদিল শাহর দখলে আসে। আদিল শাহ, শাহবাজ খাঁকে বাঙ্গলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে চুনার দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান।

এদিকে আফগান শাসকরা নিজেদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে লড়াই করছে দেখে হুমায়ুন, যিনি শের শাহের তাড়া খেয়ে ভারত ছেড়ে পারস্যে পালিয়ে গিয়েছিলেন, আবার ভারত জয়ের জন্য অগ্রসর হতে লাগলেন। ১৫৫৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি লাহোর দখল করেন। ১৫৫৫ সালের জুন মাসে দিল্লি দখল করেন। ১৫৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। এই সময় হিমু দিল্লি আক্রমণের জন্য আদিল শাহের অনুমতি প্রার্থনা করেন। আদিল শাহ হিমুকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে চুনার দুর্গে আশ্রয় নিলেন। হিমু আগ্রা আক্রমণ করলেন। আগ্রার মুঘল শাসনকর্তা ইস্কানন্দার খাঁ উজবেগ হিমুর ভয়ে পালিয়ে দিল্লিতে গিয়ে আশ্রয় নেন। দিল্লির মুঘল শাসনকর্তা তখন আলিকুলি খাঁ। হিমু অতঃপর বিশাল বাহিনী নিয়ে দিল্লি আক্রমণ করলেন। আলিকুলি খাঁর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে হিমু জয়লাভ করে দিল্লি দখল করে নিলেন। মুঘল বাহিনীর প্রচুর সৈন্য মারা যায়, বাকিরা পালিয়ে যায়। মুঘল বাহিনীর কাছ থেকে ১০০০ আরবি ঘোড়া ১৬০টি হাতি-সহ প্রচুর ধনসম্পদ পাওয়া গেল।

১৫৫৬ সালের ৭ অক্টোবর দিল্লি অধিকার করে বিক্রমাদিত্য নাম নিয়ে দিল্লির হিংহাসনে বসেন হিমু। ভারতবর্ষের এক বৃহৎ অংশের স্বাধীন হিন্দু শাসক হলেন হিন্দু সম্রাট হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্য। ইতিহাসে কোথাও তাঁর নাম লেখা হয়েছে বিক্রমাদিত্য হেমরাজ বলে। কী অসাধারণ উত্থান, সাধারণ সবজি ব্যবসায়ী থেকে একেবারে দিল্লির সিংহাসন! ভারতের ইতিহাসে তো বটেই, পৃথিবীর ইতিহাসে এর নজির পাওয়া ভার। অথচ এইরকম একটা বীরত্বের ইতিহাস আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো হয় না।

এই সময় ১৩-১৪ বছরের আকবর বৈরাম খাঁর তত্ত্বাবধানে পঞ্জাবে ছিলেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর খবর পেয়ে বৈরাম খাঁ আকবরকে মুঘল সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন। ১০ হাজার অশ্বারোহীর এক বাহিনী নিয়ে বৈরাম খাঁ দিল্লির দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য (হিমু) আকবরের মুঘল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী ও পাঁচশো হাতির এক বিশাল বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হলেন। ১৫৫৬ সালের ৫ নভেম্বর পানিপথের প্রান্তরে আকবরের মুঘল বাহিনীর সঙ্গে হিমুর ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়। একে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ বলা হয়। প্রথম পানিপথের যুদ্ধ হয়েছিল ৩০ বছর আগে আকবরের ঠাকুরদা বাবরের সঙ্গে সুলতান ইব্রাহিম লোদির। আকবর অবশ্য এই যুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন না। বৈরাম খাঁ নাবালক সম্রাটকে নিয়ে ৮ মাইল দূলে অনুগত বিশ্বস্ত সৈনিক পরিবেষ্টিত হয়ে একটি শিবিরে অবস্থান করছিলেন; যাতে পরাজিত হলে নাবালক সম্রাটকে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যেতে পারেন। রাজা বিক্রমাদিত্য (হিমু) নিজেই হাতির উপর বসে সৈন্য পরিচালনা করছিলেন। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় হিমু যুদ্ধ জয়ের পর্যায়ে চলে এসেছিলেন, হঠাৎ একটি তির তাঁর একটি চোখে বিদ্ধ হলে, তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। অচেতন হিমু-সহ হাতিটিকে আকবরের শিবিরে নিয়ে আসা হয়। বৈরাম খাঁর নির্দেশে গাজি হওয়ার জন্য (ইসলাম অনুযায়ী কাফেরকে হত্যা করলে 'গাজি' হওয়া যায় এবং তাহলে বেহেস্তে বা স্বর্গে জায়গা পাওয়া নিশ্চিত) আকবর তলোয়ারের এক কোপে অচেতন হিমুর শিরচ্ছেদ করেন। তারপর হিমুর মুণ্ডু কাবুলে প্রেরণ করা হয় এবং দেহটিকে দিল্লির গেটে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। হিমুর সৈন্যদের কাটা মুণ্ডু সাজিয়ে একটি মিনার তৈরি করে তার চারপাশে আমোদ উল্লাস করা হয়।

হিমুর পিতা ও পরিবার তখন আলোয়ারে ছিলেন। সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন একজন আফগান সেনাপতি হাজি খাঁ। আকবর আলোয়ার দখল এবং হিমুর পরিবারকে শাস্তি দানের জন্য মৌলানা পির মহম্মদ শারওয়ানিকে পাঠালেন। মৌলানা পির মহম্মদ আলোয়ার দখল করে হিমুর পিতাকে ধরে আনলেন। তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলা হলো। তিনি রাজি না হওয়ায় তাঁরও মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়।

হিমু ও তাঁর পরিবারের এই হলো অন্তিম পরিণতি। সেই মহান হিন্দু বীর অত্যন্ত সাধারণ এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও শুধু কর্মক্ষমতা ও সামরিক নৈপুণ্যের দ্বারা দিল্লির সিংহাসনে বসেছিলেন— 'তাই সময় এসেছে হেমচন্দ্রের মতো এক বিশাল ব্যক্তিত্ব ও হিন্দু বীরের কাজের পুনর্মূল্যায়ন করা। সেই মহান বীরের স্বপ্ন ও সাফল্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা, যাকে আজ দেশবাসী ভুলে গেছে''। কথাগুলি লিখেছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার। স্বাভিমানী ঐতিহাসিকদের উচিত সম্রাট হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্যের ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা।

■

চোর ও চৌকিদার

গৌতম কুমার মণ্ডল

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগের কথা। তখন গ্রামেগঞ্জে চৌকিদারেরা রাতপাহারা দিত। চোর ডাকাত ফেরেববাজদের হাত থেকে গ্রাম রক্ষার ভার ছিল চৌকিদারদের উপর। তারা উত্তরাধিকার- সূত্রেই কাজ পেত। অর্থাৎ চৌকিদারের ব্যাটাই হতো চৌকিদার। এরা জমিদারদের কাছ থেকে কিছু নিষ্কর জমি পেত, তেমনি সামান্য কিছু মাসোহারাও পেত। তবে তা খুবই কম। এই যেমন শিউলিবনা গ্রামের ভজহরি চৌকিদারের মাসিক বেতন ছিল মাত্র দু' টাকা। জমি থেকে আয় আর কী-ই বা হতো! তাই এদের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। অভাবের তাড়নায় অনেক সময় চৌকিদাররেরাই চুরির দ্রব্যে ভাগ বসাত; চোরের উপর বাটপাড়ি করত। এরকমই এক চৌকিদার ছিল আমাদের এই ভজহরি চৌকিদার, সাকিন শিউলিবনা, থানা ছাতনা।

তবে নিজের কর্তব্য ভজহরি একেবারে খাঁটি লোক। প্রতিদিন রাত্রের খাবার খেয়েই লাঠি হাতে ভজহরি বেরিয়ে পড়ত। এ পাড়া সে পাড়া হয়ে গোটা গ্রামে চক্কর কেটে গ্রামের শেষে শিবমন্দিরে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিত। বড়ো গ্রাম শিউলিবনা। গ্রামের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে মূল রাস্তা। সেই রাস্তার উপরই শিবমন্দির। আশে পাশের দু'দশটা গ্রামে যেতে হলে এই রাস্তা ছাড়া উপায় নেই। তাই এই রাস্তায় ঘোরাঘুরি করেই নিজের কাজ সারে ভজহরি। এলাকার সব চোর ভজহরিকে চেনে। আসলে না চিনে তাদের উপায় নেই। ভজহরির খপ্পরে পড়লে সোজা থানায় দারোগার কাছে যেতে হবে। আর থানার দারোগা বংশীবদনবাবু বড়ো জাঁদরেল লোক। চোর পেলেই তার ফুর্তি আর দেখে কে! চোরকে এমন মার মারেন দারোগাবাবু যে সেই চোর আর জীবনে চুরির কথা ভাবে না। বরং না খেয়ে মরে যাবে সেও ভালো কিন্তু বংশী দারোগার মার খেয়ে আর কেউ চুরির পথে পা বাড়ায় না।

এভাবে বংশী দারোগা ভজহরির কাজটা সহজ করে দিয়েছেন। এই এলাকায় যে সমস্ত চোর ধরা পড়ে তাদের প্রথমে নিয়ে আসা হয় ভজহরি চৌকিদারের আছে। এটাই নিয়ম : ভজহরিই তাদের নাড়ি নক্ষত্রের খবর নিয়ে থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু কোনো চোরই থানায় যেতে চায় না। ভজহরির এখানেই সুবিধা। চুরির মালের বারো আনা অংশ ভজহরিকে দিতে হয়, চার আনা থাকে চোরের। এই বোঝাপড়াতেই ভজহরি চোরকে থানায় চালান করে না। ধরা পড়া চোর চার আনা ভাগ নিয়েই খুশি মনে ঘরে চলে যায়।

বেশ কয়েকবছর ধরে ভজহরির সঙ্গে চোরেদের এই সম্পর্ক। কিন্তু চৌকিদারের খিদের যেন শেষ নেই। তার ভাগ মেটাতে মেটাতে চোরেরা বিরক্ত, জেরবার। কিন্তু তাদের করারও কিছু উপায় নেই। তারা যে মাঝে মাঝেই ধরা পড়ে যায়! তবে এলাকার লোকের প্রতি ভজহরির কড়া নির্দেশ ধরা পড়লেও চোরের গায়ে হাত তোলা যাবে

না। আইন তাদের হাতে নেই। তা আছে বংশী দারোগার হাতে। চোরের গায়ে হাত তুলবেন কী লাঠি তুলবেন তা বুঝবেন শুধু দারোগাবাবু। অন্য কোনো লোক ধরা পড়ে যাওয়া চোরকে মারা তো দূরের কথা, অপমান পর্যন্ত করতে পারবে না। কেউ তা অমান্য করলে সে খবর ভজহরির মাধ্যমে চলে যাবে বংশী দারোগার কাছে। যে কাজ দারোগার করার কথা তা আগেই অন্য কেউ করে দিয়েছে জানতে পারলে দারোগা রেগে যান। দারোগার এই মেজাজের কথা রাষ্ট্র করে দিয়েছে ভজহরি। ফলে তার এলাকার চোর ধরা পড়লেও লোকেরা তাদের খাতির করে ভজহরি চৌকিদারের কাছে নিয়ে আসে। তারপর বাকি কাজটা করে ভজহরি। ফলে ভজহরির চৌকিদারিতে চোরেরা একপ্রকার ভালোই আছে। চুরি বিদ্যা বড়ো বিদ্যা তারা সবাই জানে। ধরা না পড়লে সবটাই তাদের। আর ধরা পড়লেও মান অপমানের ভয় নেই। সিকি মাল নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘরে আসা যায়। মালের ভাগের মোটা অংশই চৌকিদারকেই দিতে হয় বটে, কিন্তু আর কোনো ঝামেলা নেই। তাই মোটের উপর চোরেদের এখন বড়ো সুখের সময়।

কিন্তু চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়। এই যেমন ওপাড়ার হাঁড়িরাম আর কাঁসিরামের। তারা জাতে কৈবর্ত্য-কেওট। কিন্তু জাতিগত বৃত্তি ছেড়ে পৈতৃকসূত্রেই তারা চুরির পথ ধরেছে। তারা দু'ভাই। কিন্তু ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই নয়। তাদের গলায় গলায় ভাব। দু' ভাই-ই একসঙ্গে মিলেমিশে চুরি করে। চুরির মাল এনে ফেলে দেয় বউদের হাতে। দু'জনে সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। কোনো ঝামেলা নেই। কিন্তু বারবার ধরা পড়ে আর ভজহরিকেই সবকিছু দিয়ে তাদের চুরি করার ইচ্ছেটাই চলে গেছে। অন্য কীভাবে সংসার চালানো যায় সেকথা তারা বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিল। কিন্তু ভেবে ভেবে কিছুই কুল-কিনারা পাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত আর একবার এবং এই শেষবার চুরির পথেই পা বাড়াল তারা। ভাবল সংসার যখন একেবারেই অচল তখন একরাত ঘুরে আসা যাক। কিছু তো হবে!

এইসব সাতপাঁচ ভেবে এক শীতের রাতে খালি গায়ে চপচপে তেল মেখে হাতে লাঠি সড়কি নিয়ে তারা বের হলো। কিন্তু যাবে কোন দিকে? যে দিকটাকে নিরাপদ ভাবল সে দিকটাতেই ওৎ পেতে যেন বসেছিল ভজহরি। বহুদিন পর দু'ভাইকে দেখে ভজহরির মন খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল। লাঠি হাতেই খানিকটা লাফিয়ে উঠে ভজহরি। বলল—

'কী হে, বহুদিন পর যে দু'ভাই একসঙ্গে। কাজকর্ম সব ছাড়্যেই দিলে নাকি?'

খানিকটা থতমত খেল দু'ভাই। তবে ভজহরির খপ্পরে যে পড়তে হতে পারে এ ভাবনা তাদের ছিল। তাই খানিকটা প্রস্তুতও হয়েছিল। একেবারে ভড়কে না গিয়ে হাঁড়িরামই বিপদটা সামলাল। সে বলল—

'আজ্ঞা আমরা উসব কম্ম বহুদিন হলো গিয়ে ছাইড়্যে দিয়েছি। উটা ভালো পথ লয়। কিন্তু সংসারে বড়োই অভাব। কাজকম্ম নাই। তাই বউদের হাতে ঘরদুয়ার তুল্যে দিয়ে আমরা চইল্‌লম।'

'অঃ, তা কুথায় চল্‌লি?'

'সাধু হঁইয়া যাচ্ছি আমরা। এক্কেবারে সন্ন্যাসি! এখন সোজা যাব বিন্দাবন। সেখানেই কোনো সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে তার কাছেই থাইকব। তাই চইল্‌লম।'

'ত এই রাইতের বেলায়?'

'আজ্ঞা, দিনে যাইতে লইজ্জা লাইগল।'

'ও! তবে যা। যা। ভালো কর্যে থাকবি। যা। যা।'

২

একটি নির্দিষ্ট ঘর ঠিক করেই বেরিয়েছিল হাঁড়িরাম আর কাঁসিরাম। মাইল তিনেক দূরের গ্রাম গুপ্তিপাড়ার অভয় মাস্টারের ঘর। কিন্তু ভজহরির কাছ থেকে ছাড়া পেয়েই হাঁড়িরামের মাথায় যেন বুদ্ধির বিদ্যুৎ খেলে গেল। একটু দূরে যেয়েই হাবাগোবা ভাই কাঁসিরামকে বলল—

'কাঁসি!'

'হুঁ।'

'আমরা আর গুপ্তিপাড়ায় যাব নাই। চল শিউলিবনাতেই যাই। ভজহরির ঘর।'

'অ্যাঁ! খ্যাপাই গেলি নাকি! ভজহরি চৌকিদার!'

'শুন! চুপ কইরে শুন। ভজহরি এখন বাইরে। ঘরে উয়ার বুড়ি বউটা একা। উয়াকে জব্দ করত্যে বেশি সময় লাইগবেক নাই। শালা ভজা আমাদের মতো কত চোরের উপর বাটপাড়ি কর্যে টাকার পাহাড় কর্যেছে। আজ সব টাকা আমরা লিয়ে আইসব।'

হাবাগোবা কাঁসিরামের চোখমুখ আনন্দে অধীর হয়ে উঠল। লাফ দিয়ে বলল—

'চল তবে।'

দু'ভাই পথ বদলাল। মাঠের পথ ধরে দ্রুত এসে পৌঁছল ভজহরির পাড়ায়। সামান্য একটা দুর্বল দরজা বন্ধ করে চৌকিদারের বুড়ি বউ নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। দরজা খুলতে দু'ভাইয়ের সময় লাগল না। শীতের নিস্তব্ধ রাত্রি। পাড়াপ্রতিবেশীদের কোনো সাড়াশব্দ নেই। এমনকী রাত্রের কুকুরেরও দেখা নেই। চৌকিদারের ঘরেও যে চোর আসবে তা পথের কুকুরগুলোও কল্পনা করেনি।

কাঁসিরাম দ্রুত গিয়ে ভজহরির বউয়ের মুখ একটা গামছা দিয়ে বেঁধে তাকে তারই খাটের সঙ্গে আটকে দিল। বুড়ির আর নড়াচড়ার ক্ষমতা রইল না। হাঁড়িরাম একে একে ভজহরির সব নিল— টাকাকড়ি, গয়নাগাটি, বাসনপত্র সব। চোরেদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা বহু কষ্টার্জিত ধন তারা সব নিল। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। বুড়ি বউ তেমনি বাঁধা পড়ে রইল।

ভোরবেলায় ভজহরি ঘরে এসে বউয়ের বাঁধন খুলে যখন সব কথা শুনল তখন তার মাথায় যেন বাজ পড়ল। শুধু সে কেন, কেউ কি কখনো ভেবেছে যে চৌকিদারের ঘরেও চুরি হতে পারে! তার কত অহংকার, কত দেমাক ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে গেল কে! কোন চোরের এতবড়ো বুকের পাটা! ভাবছে আর বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠছে ভজহরির। এতদিন ধরে এত চোরের কাছ থেকে আদায় করা এত্তসব ধনসম্পত্তি, গহনাগাটি, এত টাকাপয়সা সব ফাঁকা। কানাকাড়িও কিছু ফেলে রেখে যায় নাই।

অনেকক্ষণ ধরে হা-হুতাশ করার পর ভজহরি চৌকিদার বিষণ্ণ মনে থানায় এল।

থানায় একটা কাঠের নড়বড়ে চেয়ারে বসে তামাক খাচ্ছিলেন বংশীবদন দারোগা। তার পায়ের কাছে ধপাস করে বসে পড়ল ভজহরি। বুকের ভিতর থেকে হু হু করে কান্না বেরিয়ে এল তার।

ভজহরি অনেক দিন পর থানায় এল। থানার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়েই ফেলেছিল সে। তার কাজ কারবারের সব খবর দারোগার কাছে আসত। তাই ভজহরির উপর খাপ্পা ছিলেন দারোগা। তাকে পায়ের কাছে বসে কাঁদতে দেখে খুশিই হলেন দারোগা। কিছুক্ষণ কথা বললেন না। ভাবলেন ও একটু কাঁদুক, তারপর কথা বলছি।

চুরুটটা শেষ করে দারোগা ভারী গলায় বললেন—

'কী হয়েছে চৌকিদার! এখানে কাঁদতে এসেছ কেন?'

দু'চোখ মুছে আর একটু সামলে নিয়ে ভজহরি বলল—

'হুজুর আমার সব গেছে। আমি চৌকিদার, রাত্রে ঘরে থাকি না। সেই সুযোগে আমার ঘরে চুরি হয়েছে। চোরে আমার সব নিয়ে গেছে হুজুর।'

'অ্যাঁ! তোমার বাড়িতেই চুরি! চোরেরা কী বাড় বেড়েছে দেখেছ! ঠিক আছে। আমি দেখছি। চৌকিদার! তোমার কী কী গিয়েছে, মানে কী কী চুরি হয়েছে তার একটা লিস্ট বানাও।'

তারপর হাবিলদারকে একটা কাগজ আর কলম দিতে বললেন চৌকিদারকে।

চৌকিদার মেঝেতে বসে বসেই লিস্ট বানাল। সব লিখতে পারল না। নানা কথা ভেবে লিস্ট হলো খুব ছোটো। মাত্র তিন টাকা চার আনা পয়সা আর কয়েকটা হাঁড়িকুড়ি তার চুরি হয়েছে। লিস্টে অন্তত তাই লিখল।

দারোগা মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন—

'চৌকিদার, বল তোমার সন্দেহ কাদের প্রতি? আমি সব ক'টাকে ধরে এনে তোমার মাল উদ্ধার করব। চৌকিদারের ঘরে চুরি।'

আমতা আমতা করে ভজহরি কয়েকজনের নাম বলল। যেসব চোর ভাগ দেবার সময় প্রায়ই তার সঙ্গে ঝামেলা পাকাত, এমনকী আড়ালে নাকি তাকে গালিগালাজও দিত, এই সুয়োগে ভজহরি তাদেরই নাম বলে দিল। হতে পারে এরাই হয়তো রাগে তার ঘরে চুরি করেছে! দারোগার নির্দেশে হাবিলদার তাদের থানায় ধরে নিয়ে এল। দারোগার এক এক লাঠির ঘায়ে তারা জানাল চৌকিদারের ঘরে তারা কেউ চুরি করেনি। তবে চৌকিদারই বরং তাদের চুরি করা মালের বারো আনা নিয়ে তাদের থানায় আনত না। মারের চোটে আর ভজহরির উপর রাগে তারা সব কথা খুলে বলল। জানাল এখন চুরিতে আর কিছু নেই। চারদিকে এমন সব লোক লাগিয়ে রেখেছে ভজহরি যে চোর ঠিক ধরা পড়ে। আর ধরা পড়লেই ওর ষোল আনায় বারো আনা। চোরের শুধু সিকি ভাগ।

ফলে এলাকায় চুরি কমে গেছে। এতে ইদানীং সবথেকে বেশি মুশকিলে পড়েছিল ভজহরি। থানার দারোগা সব জানতেন। অনেক দিন চোর তাড়ানো মার মারতে না পেরে তারও হাত নিশপিশ করছিল। বহু দিনের রাগে আর মনের সুখে এলাকার চোরদের সামনেই তিনি দু'চার ঘা বসিয়ে দিলেন ভজহরির পাছায়।

'ও মা গো, ও বাবা রে' বলে লাফাল ভজহরি। তারপর দারোগার ধমক খেয়ে মানসম্মান সব থানার ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে ভজহরি ঘরে এল।

শূন্য ঘর। চারদিক ফাঁকা। বুড়ি বউ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। তাকে আর কী কথাই বা বলা যায়! তার এতদিনের সঞ্চিত ধন এক রাত্রে হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেল। আর থানায় ধুয়ে মুছে গেল চৌকিদারের সম্মান। চোরেদের সামনেই। এবার তাদের সামনে বুক ও মাথা উঁচু করে সে দাঁড়াবে কেমন করে! আর নয়। সে একাজ আর করতে পারবে না। আর না। এ জীবনে চোরদের সঙ্গে সে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না। কিন্তু বাঁচা যায় কীভাবে! অনেক কথা ভাবার পর তার মনে এল সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবার কথা! হ্যাঁ! ওই তো হাঁড়ি আর কাঁসি যদি সাধু হয়ে চলে যেতে পারে তাহলে সেও পারবে। মন স্থির করতে দিন দশেক ভাবল ভজহরি। চৌকিদারির কাজে সে আর যায় না। রাত্রির বেশিরভাগ সময়ই বিনিদ্র কাটে। সাধু হয়ে সে কোথায় যাবে, কী করবে চোখ বুজলেই এসব আকাশকুসুম ভাবনা তার মনকে গ্রাস করে। আর না। সে এবার চলেই যাবে।

৩

দিন দশেক ভাবার পর এক রাত্রে বেরিয়ে পড়ল ভজহরি। বউকে সব কথা বলেই বেরিয়েছে। বউ সম্মতি দিয়েছে। তাই নিশুতি রাতে পরিচিত পথ বেয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। দিনে সাধু হয়ে যেতে তারও লজ্জা লাগল। সেই পথ, সেই রাত্রির শিবমন্দির, সেই রাত্রির নিস্তব্ধতা। রাত্রির জগৎ তার পরিচিত। সেই পরিচিত জগৎ আর পরিচিত পথ দিয়েই এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জীবনের উদ্দেশে পাড়ি দিল ভজহরি। মন চল বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনেই গেছে হাঁড়ি আর কাঁসি। যদি তাদের সঙ্গে দেখা হয় এক সঙ্গেই থাকা যাবে, পথ চলা যাবে। আর যাই হোক গাঁয়ের লোক তো! নিশ্চয়ই এখন তারা থিতু হয়ে কোথাও বসেছে। হয়তো সাধু সমাজে খানিকটা পরিচিতি পেয়েছে। চোরের সঙ্গ ছেড়ে সাধুসঙ্গের জন্য তার এই নিশীথ যাত্রা। আর যাই হোক চোরের সঙ্গ তো ছাড়া গেল! চোরের ধনের ভাগ নেওয়া অপরাধ। এই পাপের শাস্তি তো তাকে পেতেই হতো। তাই আর না। চোরের ত্রিসীমানায় আর থাকা চলবে না। সাধু হয়ে শেষ জীবনে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করে নিতে হবে। এইসব ভাবতে ভাবতে নিশীথ রাত্রিকে দু'পাশে রেখে পথ চলতে থাকল ভজহরি। দ্রুত পায়ে। ভোরের আগেই পরিচিত এলাকা ছেড়ে অপরিচিতের মাঝে হারিয়ে যেতে হবে।

শিবমন্দির থেকে মাইল খানেক যাওয়ার পরেই পথে দেখা হাঁড়িরাম আর কাঁসিরামের সঙ্গে। তারা দু'ভাই রাত্রে নিজেদের কাজে বেরিয়েছিল। দূর থেকে তারাই প্রথম দেখে ভজহরিকে এগিয়ে আসতে। এত দূরেও চৌকিদার চলে এল দেখে তারা অবাক। খানিকটা লুকোনোর চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। তাই চালাক হাঁড়িরামই কথা শুরু করল—

'কী গো খুড়া, এত দূরে চল্যে আসল্যে?'

প্রশ্ন শুনে আর পরিচিত গলা শুনে

কেঁপে উঠল ভজহরির শরীর। খানিকটা ভয়ও পেল। অবাক হয়ে দেখল সাধু হয়ে চলে যাওয়া দুই ভাই হাঁড়িরাম আর কাঁসিরাম! তাদের কাছেই যাবে ঠিক করেছিল ভজহরি। তা তারাই বৃন্দাবন ছেড়ে এই রাত্রির পথে কেন? অসীম বিস্ময়ে থতমত খেয়ে ভজহরি প্রশ্ন করল—

'হুঁ, ত তরা ইখেনে? তরা ত সাধু হঁইয়ে চলো গেছিলি! সেদিন রাইতে আমাকে বল্যেই চইল্যে গেলি!'

হাঁড়িরাম প্রস্তুত ছিল। নিজেকে সামলে আর হাবাগোবা কাঁসির পেটে একটু চিমটি কেটে উত্তর দিল—

'ঘুর‍্যে আলুম খুড়া। বড়ো কষ্ট। সাধু হঁইয়ে ইখেন সেখেন ঘুর‍্যে বেড়ানো বড়ো কষ্টের। পাইরলম নাই। বিন্দাবন তক্ক যাই নাই। কিছুদূর যাইঞেই মনটা ঘরের দিকে টাইনল। বউ দু'টার কথা মনে পইড়ল। আর ঘুর‍্যে আলুম।'

'হায় ভগবান!'

বলেই থপ করে রাস্তার মাঝেই বসে পড়ল ভজহরি।

'কী হইল গো খুড়া! অমন কর‍্যে বস্যে দিলে কেন?'

'আমার আর হইল নাই রে। তোদের আশায় আমিও সাধু হবার জন্যে পথে বার হল্যাম, আর তরাই ইকথা বলছিস?'

'তুমি কেন সাধু হবে গো খুড়া? তুমার দুঃখ কী?'

খানিকক্ষণ হায় হায় আর হা-হুতাশ করার পর ভজহরি সব কথা তাদের খুলে বলল। জানাল যে রাত্রে তারা সাধু হওয়ার জন্য বেরিয়েছিল সেই রাত থেকেই তার জীবন বদলে গেছে। নিজের বাড়িতে সর্বস্ব চুরি, থানায় অপমান, দারোগার হাতে মার খাওয়া সব কথা বলল ভজহরি। সব খুলে বলে যেন বুকটা একটু হালকা হলো তার।

সান্ত্বনা দিল হাঁড়িরাম আর কাঁসিরাম। কাঁসিরাম ভজহরির পিঠে হাত বুলোতে লাগল। হাঁড়িরাম বলল—

'তোমার সাধু হঁইয়ে কাজ নাই খুড়া। সাধু হওয়া বড়ো কষ্টের। তার চায়্যা চল তুমি শিউলিবনার থাক্যে দূরে নিকুঞ্জপুরে। হোথায় আমার মামার বাড়ি। মামা-টামা এখন কেউ নাই। দেদার ডাঙা জায়গা আছে। সব এখন আমাদের। উখানে নদীর ধারে তুমি চল একটা আশ্রম কইরবে। আমরা তুমার চ্যালা হব। সব চোর তুমার শিষ্য হব। তুমি কালী ঠাকুরের পূজা কইরবে। আমরা পূজা দিব। আর আমাদের চুরির ভাগ তুমি পাবে, মায়ের পূজা চালাত্যে ত খরচ আছে। আমার অনেক দিনের শখ ছিল ইটা। পারি নাই। তুমি কর। চৌকিদারি ছাড়। সাধু হয়ে আশ্রমে আরামসে থাকো। আমরা সবাই তুমার শিষ্য।'

এক নিশ্বাসে অনেক পরিকল্পনার কথা বলে থামল হাঁড়িরাম। আর নতুন পথের কথা শুনে ভাবতে শুরু করল ভজহরি। আবার সেই চোরের সঙ্গ! আমি সাধু আর শিষ্যেরা সব চোর! না না। এ হয় না। কিন্তু বৃন্দাবনে তো হাঁড়ি-কাঁসি কেউ নেই। সে থাকবে কোথায়! ঘরে ফিরে যাবে! ঘর তো শূন্য। শুধু বুড়ি বউ বসে আছে। সে যাবে কোথায়!

সাত পাঁচ ভেবে হাঁড়িরামের কথায় সায় দিল ভজহরি।

৪

অনেকটা জায়গা জুড়ে ছোট্ট নদীর তীরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল ভজহরির আশ্রম। বাঁশ লতা পাতা আর ডালপালা দিয়ে প্রশস্ত জায়গা বেড়া দেওয়া হলো। মাঝখানে দুটো মাটি আর খোলার ঘর। একটা ঘরে মা কালীর মন্দির। পাশের ঘরের গোবরে প্রলেপ দেওয়া চকচকে আঙিনার উপর খাটিয়া পেতে বসে চুল শুকায় ভজরির বুড়ি বউ। হাঁড়ি আর কাঁসি মাঝে মধ্যেই আসে আর সবকিছুর তদারক করে যায়। তাদের মামাবাড়ির জায়গা বলে কথা। সেখানেই গড়ে উঠছে এত সুন্দর আশ্রম, মা কালীর মন্দির। ভজহরি চৌকিদার আশ্রম খুলেছেন— খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে চোরেদের মধ্যে। হাঁড়ি আর কাঁসির কাছ থেকেও অনেকে শুনেছে। সবাই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। কিন্তু চৌকিদারকে অসম্মান করেনি তারা। মাঝে মধ্যেই কেউ না কেউ আশ্রমে আসে। আর পূজার নিমিত্তে দান দিয়ে যায় ভজহরির কাছে। ভজহরি তাদের সবার খোঁজখবর নেয়। সুখদুঃখের গল্প করে। মনটা তার পুরো সাধুর মন হয়ে উঠেছে। সবাইকে বলে—

—জোর নয় বাপু। যার যা মন চায় মায়ের পূজার জন্য দিয়ে যাবি। আমি চাইব না কিছুই। চাইতে হয় না ভজহরিকে।

আশ্রম দিনে দিনে বড়ো হয়ে ওঠে। ▮

খেলার দুনিয়ার টুকরো খবর

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

পালমারকে পাচ্ছে ভারত : প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্কোয়াশ খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড পালমারকে কোচ হিসেবে পেতে চলেছে ভারতীয় স্কোয়াশ খেলোয়াড়রা। ২০১৪-য় কমনওয়েলথ গেমসে সিঙ্গলস ও মিক্সড ডাবলস মিলিয়ে তিন সোনাজয়ী পালমার স্কোয়াশের দুনিয়ায় ইদানীংকালে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। যেমন ৮০-র দশকে ছিলেন পাকিস্তানি তারকা জাহাঙ্গির খান ও জানশের খান। পাকিস্তানের হাত থেকে ব্যাটন কেড়ে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া এখন স্কোয়াশে এক বড়ো শক্তি। এহেন শক্তিশালী দেশের সেরা তারকাকে কোচ হিসেবে পেলে ভারতীয় স্কোয়াশের মান অনেক উন্নত হবে নিঃসন্দেহে। স্কোয়াশ র‍্যাকেট ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার সচিব সাইরাস পুনেচা জানিয়েছেন তাঁদের তরফে সাইকে পালমারকে এদেশে কোচ হিসেবে নিয়ে আসার জন্য যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তা সানন্দে গ্রহণ করেছে সাই এবং আকর্ষণীয় প্যাকেজ দেওয়ার ব্যাপারে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। অতীতে বিশ্বখ্যাত অজি হকিতারকা টেরি ওয়ালশকে ভারতীয় দলের কোচ করে নিয়ে আসার পর আর্থিক ব্যাপারে মতবিরোধ হওয়ায় ওয়ালশ দেশে ফিরে গেছিলেন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভারতীয় হকি। ওয়ালশের কোচিংয়ে ভারত অস্ট্রেলিয়াকে তাদের দেশে গিয়ে টেস্ট সিরিজে দুরমুশ করে এসেছিল। তারপরই ছন্দপতন ওয়ালশের ফিরে যাওয়ার পর। স্কোয়াশের ক্ষেত্রে তেমন কিছু হবে না বলেই সাইয়ের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। মার্চ মাসে কুয়ালালামপুরে বিশ্ব মিট। সেই মিটের দিকে তাকিয়েই পালমারকে আনা হয়েছে।

নতুন নিয়মকে ধন্যবাদ সাথিয়ানের : ভারতের তারকা টেবল টেনিস খেলোয়াড় জি সাথিয়ান বিশ্ব টেবল টেনিস সংস্থার নতুন প্রবর্তিত রিভিউ সিস্টেমকে স্বাগত জানিয়েছেন। সাথিয়ান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথেষ্ট স্বীকৃত এক খেলোয়াড়। সম্প্রতি আই টি টি এফ গ্রান্ড ওয়ার্ল্ড টুর ফাইনালসে এই নতুন সিস্টেম চালু করা হয়। বিশ্বের সব দেশের খেলোয়াড়রা এই নিয়মের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন বলে তার অভিমত। খেলোয়াড়, কোচ, অফিসিয়াল, দর্শক, স্পনসর, স্টেক হোল্ডার সবাই এতে উপকৃত হবে। ম্যাচ আম্পায়ার কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিলে এই সিস্টেমের সাহায্য নিয়ে তা সংশোধন করার ব্যবস্থা থাকবে। তাতে খেলাটির স্বচ্ছতা ও গুরুত্ব বহুলাংশে বেড়ে যাবে। বল ট্র্যাকিং টেকনোলজিকে মাল্টি ক্যামেরার সাহায্যে পরীক্ষা করে বলের অ্যাঙ্গল, বলের গতিবিধি ও নেটে টপস্পিনের ডায়নমিক্স ধরা পড়ে যাবে। এতে যোগ্য খেলোয়াড়ই পয়েন্ট পাবে, যেটা তার প্রাপ্য। দুনিয়া জুড়ে সব প্রধান খেলার বড়ো বড়ো আসরে এই ভিডিয়ো রেফারেল পদ্ধতি প্রয়োগে রীতিমতো সুফল পাওয়া গেছে। তাহলে টেবল টেনিসই বা কেন পিছিয়ে থাকবে। বিশ্বের প্রায় সব দেশে টেবল টেনিস চর্চা হয় সব স্তরে। সারা বছর ধরে অসংখ্য টুর্নামেন্ট চলে। কয়েক লক্ষ রেডিস্টার্ড খেলোয়াড় এই খেলার সঙ্গে জড়িত। সাথিয়ানের আশা, সদ্য তৈরি হওয়া এই সিস্টেম তার যাবতীয় সীমারেখা কাটিয়ে অচিরেই সমস্ত খেলোয়াড় ও খেলাটির উন্নতি সাধন করবে।

এফওয়ানের বিকল্প কি এফই : দেশে দেশে যেভাবে ফর্মুলা ই-র জনপ্রিয়তা বাড়ছে তাতে চাপে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ফর্মুলাওয়ানের। এফওয়ান চলে আসছে সত্তর বছর ধরে। সারা বছরে ২০টি দেশে ২০টি এফওয়ান গ্রাপ্রি রেস হয়। ব্রিটিশার সুইস হ্যামিলটন বর্তমানে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। টানা ৬ বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে হল অব ফেমে কিংবদন্তীদের পাশে স্থান পেয়ে গেছেন। এই ইভেন্টের সব বিশ্বতারকার নাম জানে কয়েকশো কোটি মানুষ। এই রেসকে ঘিরে ২০টি দেশে যেভাবে পারিকাঠামো ও ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি হয়েছে তা নিঃসন্দেহে খেলাটির গ্রহণযোগ্যতাকে অন্য মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু মাত্র তিন-চার বছরে যেভাবে ফর্মুলাই বা এফই জাঁকিয়ে বসেছে নানা দেশে তাতে বড়োসড়ো চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে ট্রাডিশনাল এফওয়ান। আরও বেশি গতিময়তা, আরও রোমাঞ্চকর উন্মাদনা সর্বোপরি আরও বেশি বাণিজ্যায়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হয়েছে এই ইভেন্ট। এফওয়ানের অনেক বাইকারও আর্কিটেক্স এফই রেসে অংশগ্রহণ করছে। গত মরসুমে এফওয়ানের সঙ্গে যুক্ত তিনটি বহুজাতিক রেসিং করে সংস্থা এফই রেসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক মোটর রেসিং সংস্থা এফইকে সুপার ক্যাটাগরির রেসিংয়ের মর্যাদা দিয়েছে।

এই মর্যাদা প্রদানকে লুইস হ্যামিলটন থেকে কামান্দো অ্যালানসো, সেবাস্টিয়ান ভেটেল, মার্কওয়েবারের মতন সুপার রেসাররা অভিনন্দনে ভরিয়ে দিয়েছে। একই সঙ্গে গতির দুনিয়ায় নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলে তারা মনে করেন। ▮

বীর চিলা রায়

বীর চিলা রায় ছিলেন শক্তিশালী কোচ-কামতাপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ব সিংহের সুযোগ্য পুত্র। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর কামতা রাজ্যের রাজা নরনারায়ণের ছোটো ভাই। ১৫১০খ্রিস্টাব্দের মাঘীপূর্ণিমার দিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম শুক্লধ্বজ। তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতিশ, স্মৃতি, শ্রুতি, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি যুদ্ধবিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন। সর্বসাধারণের কাছে তিনি চিলা রায় নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজা নরনারায়ণের সর্বাধিনায়ক তথা সেনাপতি। তাঁর গতি ছিল চিলের ন্যায় ক্ষিপ্র। যুদ্ধকৌশলও ছিল চিলের মতো। স্থানীয় রাজবংশী ভাষায় চিলকে বলা হয় চিলা। চিলের মতো তীব্র গতিতে ছোঁ মেরে শত্রুসৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পর্যুদস্ত করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন। তিনি বীরত্বের দ্বারা তাঁর দাদা মহারাজা নরনারায়ণের সাম্রাজ্য প্রসারিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

চিলা রায় বর্তমান উত্তরবঙ্গ, বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ, অসম-সহ পুরো উত্তর-পূর্বে রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। তিনি শ্রীমন্ত শঙ্করদেবকে সুরক্ষা ও আশ্রয় দিয়ে তাঁর ভাগিনী কমলাপ্রিয়া ওরফে ভুবনেশ্বরীকে বিয়ে করেছিলেন। কেবল তাঁর রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই শঙ্করদেব অসমে ধর্মপ্রতিষ্ঠা করতে এবং সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

চিলা রায় দুর্দান্ত সাহসী ও যোদ্ধা(কাইট প্রিন্স), তৎকালীন ভারতীয় ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো বীর ও সামরিক কৌশলবিদ ছিলেন। তাঁর বীরত্ব ভুটিয়া, কাছাড়ি রাজ্য এবং অহোমদের ওপর কোচ-রাজবংশী আধিপত্যকে সুনিশ্চিত করেছিল। ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁরই নেতৃত্বে রাজবংশীরা গহরগাঁও অহম রাজধানী দখল করতে সক্ষম হয়।এই যুদ্ধে তিনি অভূতপূর্ব সামরিক দক্ষতার পরিচয় দেন। মণিপুরের তৎকালীন রাজা এবং খাসির প্রধান (বিরিয়াবন্ত) বেশ কয়েকজন রাজা তাঁর সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। জয়ন্তিয়া , ত্রিপুরা ও সিলেটের রাজাকেও তিনি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিলেন। একথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় যে, চিলা রায় কখনোও কোনো পরাজিত রাজা বা নিরীহ মানুষদের ওপর বর্বরতাপূর্ণ আচরণ করেননি। কেবলমাত্র যে রাজারা তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলেন কেবল তাদের সঙ্গেই তিনি সেইমতো আচরণ করেছিলেন।

চিলা রায় গেরিলা যুদ্ধপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। বলা হয়, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের আগেই তিনি গেরিলা যুদ্ধকৌশলে পারদর্শী ছিলেন। এরপর চিলা রায় ও মহারাজা নরনারায়ণ দক্ষিণবঙ্গে রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হন। কিন্তু অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে চিলা রায় আফগান সুলতান সুলেমান কাররানির হাতে বন্দি হন। মহারাজা নরনারায়ণ তাঁর রাজধানীতে ফিরে আসেন। পরে চিলা রায় মুক্তি লাভ করেন। এরপর কোচরাজ্যের বেশিরভাগ অংশ আফগানদের হস্তগত হয়। তবে চিলা রায় ও মহারাজা নরনারায়ণ আফগান সেনাবাহিনীর দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত কামাখ্যা মন্দিরের পুনর্নির্মাণ করেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি নির্মাণ হয়। ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে বীর চিলা রায়ের জীবনাবসান হয়।

অমর রায়

ভারতের পথে পথে

সিমলা

২২১৩ মিটার উঁচুতে ভারতের বৃহত্তম পাহাড়ি শহর হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলা। সিমলাকে বলা হয় পাহাড়ের রানি। প্রসপেক্ট হিল, সামার হিল, অবজারভেটরি হিল, ইনভেরাম, এলিসিয়াম, বানটনি ও জকু— এই সাত পাহাড় নিয়ে গড়া ১৮ বর্গকিলোমিটার ব্যাপ্ত সিমলা পাহাড়। পাহাড়গুলির নাম দিয়েছে ইংরেজরা। এখানকার পরিবেশ শান্ত, মধুর ও শুষ্ক বাতাস। অর্ধচন্দ্রাকার পর্বতমালার নয়নাভিরাম প্রকৃতির মাঝে সিমলা শহর। বৃটিশরাজের 'জুয়েল অব দ্য ক্রাউন' সিমলাশহর তাদের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল। ওক, ফার, দেবদারু ও পাইনের সবুজে ঘেরা সিমলার আর এক আকর্ষণ লিলি, রডোডেনড্রন ও নাম না জানা নানা পাহাড়ি ফুলের সমারোহ। ইংরেজদের তৈরি সিমলার অভিজাত ম্যাল বাজার পর্যটকদের খুবই আকর্ষণীয়। চড়াই পথে রয়েছে সিমলা কালীবাড়ি। রয়েছে মঙ্গলচণ্ডী ও শ্যামলাদেবীর মন্দির। শ্যামলাদেবীর নামানুসারে এই শহরের নাম হয়েছে সিমলা। জকু হিলসের চূড়োয় রয়েছে হনুমান মন্দির।

জানো কি?

- মানবদেহে ইউরিয়া যকৃত থেকে উৎপন্ন হয়।
- মানব মূত্রের প্রধান রেচন পদার্থ ইউরিয়া।
- হিমোগ্লোবিন বিশ্লিষ্ট হয়ে বিলিরুবিন ও বিলিভার্ড সৃষ্টি হয়।
- পিত্তরস ক্ষরিত হয় যকৃত থেকে।
- পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে এ এইচ ডি হরমোন ক্ষরিত হয়।
- রক্ত থেকে মূত্র যে অংশের দ্বারা পরিশ্রুত হয় তার নাম গ্লোমেরুলাস।
- বৃক্কের অবতল খাঁজের নাম হাইলাম।

ভালো কথা

হসপিটাল ম্যান

একটা সেকেন্ডহ্যান্ড মারুতি ইকো পুলকার চালান পার্থ করচৌধুরী।। কলকাতার কালীঘাটের মহামায়া লেনে থাকেন। সারাদিন পুলকার চালিয়ে যা পান তা দিয়েই সংসার চালান। রাত্রি ন'টার পর এলাকার কয়েকটা হোটেল থেকে বেঁচে যাওয়া খাবার চেয়ে চেয়ে নিয়ে রাত দশটা বাজলেই পৌঁছে যান হাসপাতালে। সেখানে দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীদের জন্য তাদের সঙ্গে আসা লোকজনের হাতে তুলে দেন বিনি পয়সায় সেই খাবার। ভালোবেসে সবাই তাঁকে ডাকেন 'হসপিটাল ম্যান' বলে। এখন তিনি প্রতি রাতে তিনটি হাসপাতালে ১৭০ জন রাগীর হাত তুলে দেন খাবার। তিনি একবার হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় খিদেয় খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। রাত দশটার পর সব দোকান বন্ধ হয় যাওয়ায় কোনো খাবার পাওয়া যায় না। তখন রোগীদের খুব কষ্ট হয়। সেই অনুভবেই তিনি এই কাজ শুরু করেছেন। এখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররাও তাঁকে সহযোগিতা করছেন। তিনি এই কাজকে ঈশ্বরের পূজা বলে মনে করেন।

শ্রেয়া মুখার্জি, দ্বাদশ শ্রেণী, ৮৭/১ আশুতোষ মুখার্জি, রোড, কলকাতা-২৫

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ঠাণ্ডা গরম

সত্যম মাহাত, সপ্তম শ্রেণী, ঝিলিমিলি, বাঁকুড়া।

ঠাণ্ডা গরম ঠাণ্ডা গরম
শীতের দিনে গরম নরম।
এমন কখনোও হয় নাকি
শীতের বেলা এত ফাঁকি?

শীতের দিনে এত ফাঁকি
শীতের কাপড় কোথায় রাখি?
প্রকৃতির কেন উলটো গীত
গরমকালে কি পড়বে শীত?

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ২৩।।

কিষান রেল যোজনা চাষিকে ঋণমুক্ত করার ক্ষেত্রে বড়ো পদক্ষেপ

অশ্বিনী মহাজন

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড)-এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রামে বসবাসকারী কৃষকের আমদানি মাত্র ২৩ শতাংশ কৃষিকাজ থেকে হয়ে থাকে। যেখানে মজদুরি ও সরকারি নিজস্ব ক্ষেত্রে চাকরি থেকে গৃহস্থের প্রাপ্তি ৬৭.১ শতাংশ। এর থেকে এটা বোঝা যায় যে কৃষিকাজ ও গ্রাম জিডিপি বৃদ্ধির প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বাইরে। আজ যখন দেশের ৭০ শতাংশ জনসংখ্যা গ্রামে থাকে, তখন এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে গ্রামের অবস্থা কী হয়ে রয়েছে।

নাবার্ডের ২০১৬-১৭ সংকলিত তথ্য অনুসারে গ্রাম ও শহরের প্রতি ব্যক্তির আয়ের ব্যবধান ছিল ১২.৩ গুণ। ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষে সেখানে গ্রামে প্রতি ব্যক্তির বার্ষিক আয় মাত্র ২২৭০০ টাকা ও শহরে প্রতি ব্যক্তির বার্ষিক আয় ছিল ২,৭৯,৬০০ টাকা। নাবার্ডের এই তথ্য অনুযায়ী ২০১৬-১৭ আর্থিকবর্ষে প্রতি গ্রামীণ কৃষক গৃহস্থের আয় ১,০৭,২৪৪ টাকা ছিল সেখানে অকৃষক পরিবার প্রতি আয় আরও কম, মাত্র ৮৭,২২৮ টাকা। গ্রামের সমস্ত গৃহস্থের গড় বার্ষিক আয় ৯৬,৭০৮ টাকা।

শহর ও গ্রামীণ ক্ষেত্রের মধ্যে বেড়ে চলা এই আর্থিক ব্যবধান নীতি-নির্ধারকদের বেশ চিন্তার ও চ্যালেঞ্জের বিষয়। এটিই গ্রাম থেকে শহরে পলায়নের কারণ এবং গরিব ও বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধির সংকেতও বটে। আমাদের এটির কারণ ও সমাধান খুঁজতে হবে, কিন্তু এটি স্পষ্ট যে জিডিপির বৃদ্ধি সত্ত্বেও গ্রামীণ ক্ষেত্রে আমদানির আশাপ্রদ রূপে বৃদ্ধি হয়নি, সেখানে গরিব ও বেকারত্বের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০২০-২১ আর্থিকবর্ষের বাজেট খসড়া প্রস্তুতির সময় অর্থমন্ত্রীর সামনে অনেকগুলি চ্যালেঞ্জ ছিল। এর মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা গ্রাম ও কৃষকদের নিয়ে ছিল যেটি দীর্ঘ সময় ধরে সংকটপূর্ণ অবস্থায় আছে। শুধুমাত্র আয়ের নয়, গ্রামে বেকারত্বের সমস্যাও ভারি সংকটে রয়েছে।

বিগত সময়ে সরকার তার প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করে চলেছে যে, ২০২২ পর্যন্ত কৃষকের আয় দ্বিগুণ মাত্রায় বৃদ্ধি হবে। সেই যোজনা অনুসারে 'Soil health Card', ফসল বিমা যোজনা, উৎপাদন মূল্যের সঙ্গে ৫০ শতাংশ যুক্ত করে সহায়ক মূল্য নির্ধারণ, দুগ্ধ উৎপাদন ও মাছ চাষে উৎসাহ প্রদান, সেচ বিষয়ক যোজনা সমেত অনেক উপায়ের মাধ্যমে সরকার সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিছু ভালো ফলও আমরা দেখতে পেয়েছি। যেমন ডালশস্য, তিল , ফল, সবজির উৎপাদনে বৃদ্ধি। কৃষকের আমদানিতে সহায়তার স্বার্থে Di-

rect benefit Scheme-এর মাধ্যমে সোজা ব্যাঙ্কের খাতা কৃষক সম্মান নিধি পাঠানোর ব্যবস্থা প্রশংসিত হয়েছে। অনেক আগে থেকেই দাবি ছিল পৃথক কৃষি বাজেট করার। কারণ কৃষি এমন একটি বিষয় যেটির সঙ্গে কৃষি, খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ, লঘু উদ্যোগ, রসায়ন-সমেত অনেকগুলি মন্ত্রণালয় সরাসরি সম্বন্ধিত। এর জন্য কোনো একটি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দ্বারা এর বাজেট বানানো সম্ভব নয়। কিন্তু এবার বাজেটে যেভাবে সবিস্তারে কৃষি ও কৃষক সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে, তাতে কৃষি বাজেটের দিকে পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। এটি কৃষির প্রতি সরকার কতটা সংবেদনশীল তার সংকেত তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে কৃষি সম্বন্ধিত সমস্যার আন্তরিক ভাবে সমাধানের প্রচেষ্টাও সিদ্ধ করছে। এবারের বাজেটে ১৬টি বিষয়ের এক কার্যযোজনা আলোচিত হয়েছে। বাজেটে মোট ২.৮৩ লক্ষ কোটি টাকা কৃষি সহায়ক গতিবিধি, সেচ ও গ্রামীণ বিকাশের খাতে বরাদ্দ হয়েছে।

বাজেটে বলা হয়েছে যে, ১০০টির উপর জেলা যেখানে জলসংকট আছে, সেগুলির জন্য বৃহৎ সেচ যোজনা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে খরাপ্রবণ জেলাগুলি জলসংকট মুক্ত হবে। জল সংরক্ষণ, ড্রিপ সেচ ইত্যাদি উপযুক্ত উপায় গ্রহণ করা হবে। অনেক সময় চাষির কাছে অনুর্বর, পাথরযুক্ত চাষ-আযোগ্য জমি পড়ে থাকে, সেগুলি তাদের আয়ের পথকে প্রশস্ত করে না। এই ধরনের জমির উপর সৌরশক্তি উৎপাদক যন্ত্র লাগানোর জন্য সরকার সাহায্য করবে। সেখান থেকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করতে পারবে যা তাদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

আজকে কৃষক সঠিক গুদাম ও হিমঘরের সুবিধার অভাবের কারণে নিজের ফসল কম দামে তাড়াতাড়ি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। অনেক সময় উৎপাদিত ফসল নষ্টও হয়ে যায়। বাজেটে গুদামজাত করার বিশেষ উপায়ের কথা উল্লেখ করে মহিলাদের স্ব-রোজগার সমূহের মাধ্যমে গুদাম বানানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। স্ব-রোজগার সমূহের দ্বারা মহিলারা আত্মনির্ভর হয়ে উঠছেন। তাদের সহায়তায় এবার গ্রামের ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমস্যার নিরাকরণও সম্ভব হবে।

বিগত কিছু সময় ধরে সরকার গ্রামে ডেয়ারি প্রকল্পের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির উপর

> **২০২০-২১ বাজেটে কৃষকের উন্নতির স্বার্থে অনেকগুলি যোজনা শুরু হয়েছে এবং পুরনো যোজনাগুলির পূর্ণ মূল্যায়ানের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু কৃষির স্বার্থে বাজেটে যে পরিমাণ বরাদ্দ তা এই মহত্ত্বাকাঙ্ক্ষী যোজনার জন্য পর্যাপ্ত নয়। আশা করা যায় ভবিষ্যতে কৃষিখাতে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানো হবে।**

জোর দিয়েছে। ডেয়ারির জন্য কিষান ক্রেডিট কার্ড, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচানোর জন্য IRCP ইত্যাদি প্রকল্প আছে। যথাযথ প্রক্রিয়াকরণের (Processing Pretreatment)-এর অভাবে ব্যাপক পরিমাণ দুধ নষ্ট হয়। ফলে ডেয়ারি কৃষক নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। ডেয়ারি প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি ৫৩৫ থেকে ১০৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন করা হলেও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। গুজরাট-সহ অনেক রাজ্যে দুগ্ধ-উৎপাদনে প্রভূত সুফল পাওয়া গেছে।

দূরদূরান্তের কৃষকদের জমিতে সেচের জন্য বিদ্যুৎচালিত পাম্প ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে মোটা টাকা পাম্পের বিদ্যুতের খরচে চলে যায়। সৌরশক্তি চালিত পাম্পের ব্যবহার চাষি নিজ খরচায় ভাবতেও পারে না সরকারি অনুদান ছাড়া। এই বিষয়ে সেচের সুবিধার জন্য বাজেটে ২০ লক্ষ সোলার পাম্প দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর সুবিধা সব ধরনের কৃষক নিতে পারবেন।

সবুজ বিপ্লবের সময় থেকে দেশে সেই সময়কার প্রয়োজন অনুসারে রাসায়নিক সারের জন্য সরকারি ভরতুকি দেওয়া হয়েছিল এবং তা পরে সময়ে সময়ে বেড়েছে। কৃষিবিজ্ঞানীদের মত অনুযায়ী দেশে ধীরে ধীরে রাসায়নিক সারের বদলে জৈবিক সারের প্রচলন বাড়ানোর ওপর জোর দিতে হবে। এর জন্য মোদী সরকার আসার পর থেকেই জৈবিক সারের ব্যবহারে ভরতুকি দেওয়া শুরু হয়েছে, যার ফলে কৃষি উৎপাদনে লাভ পাওয়া যাচ্ছে। এতদিন রাসায়নিক সারের ভরতুকি কোম্পানিকে দেওয়া হতো। এখন সরাসরি কৃষকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এরকম ফসলের বিক্রির জন্য ভারতীয় রেল দ্বারা ‘কিষান রেল’-এর মতো যোজনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে চাষিরা তাদের ফসল দূরের বাজারেও বিক্রির জন্য নিয়ে যেতে পারবেন। মূলধনের কারণে এবং ঋণে ডুবে থাকা চাষিরা ফসল খুব কম দামে বাজারে বিক্রি করতে বাধ্য হন। এই বাজেটে চাষিদের জন্য গুদামের রসিদের ভিত্তিতে ঋণ পাওয়ার শর্ত রাখা হয়েছে যা একটি বড়ো পদক্ষেপ মনে করা হচ্ছে। এটি চাষিদের ঋণভার ঘোচানোর ও আর্থিক উত্থানের স্বার্থে একটি বড়ো পদক্ষেপ। সঙ্গে সঙ্গেই নাবার্ডের সুবিধাগুলি পুনর্নবীকরণ করার সুযোগও দেওয়া হয়েছে।

মোট ১৫ লক্ষ কোটি টাকার কৃষিঋণ লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে কৃষি ও কৃষক বাদে অন্য দুই ক্ষেত্রেই আয় বৃদ্ধির জন্য মাছ চাষের উপর জোর দেওয় হয়েছে। এই সম্বন্ধিত সামুদ্রিক মাছের বিকাশ ও সংরক্ষণের জন্য বিশেষ কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। ২০২২-২৩ পর্যন্ত মাছের উৎপাদন ২০০ লক্ষ টন পর্যন্ত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ যুবকদের নিয়ে ‘সাগর মিত্র’ নামে একটি যোজনার মাধ্যমে ৫০০ কৃষকের একটি এফপিও তৈরি করা হবে।

বর্তমান ২০২০-২১ বাজেটে কৃষকের উন্নতির স্বার্থে অনেকগুলি যোজনা শুরু হয়েছে এবং পুরনো যোজনাগুলির পূর্ণ মূল্যায়ানের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু কৃষির স্বার্থে বাজেটে যে পরিমাণ বরাদ্দ তা এই মহত্ত্বাকাঙ্ক্ষী যোজনার জন্য পর্যাপ্ত নয়। আশা করা যায় ভবিষ্যতে কৃষিখাতে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানো হবে।

(লেখক দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অর্থনীতিক বিশ্লেষক এবং স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের সহ-সম্পাদক)

ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হিন্দুবিদ্বেষ নয়

অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য

৩৯৫টি ধারা ও ৮টি তালিকা নিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর খণ্ডিত স্বাধীন ভারতের সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়। সংবিধানটি নির্মাণ করতে গণপরিষদের চিন্তাবিদরা সময় নিয়েছিলেন ২ বছর ১১ মাস ১৭ দিন--- যা প্রায় তিন বছর। গণপরিষদের অধিবেশন বসেছিল ১১ বার, ১৬৫ দিন। এক একটি অধিবেশন গড়ে ১৫ দিন। গণপরিষদের সদস্যরা যথেষ্ট সময় নিয়ে খুব ধীরে সুস্থে মতামত বিনিময় ও আলোচনা করেই বিশ্বের বৃহত্তম সংবিধানটি রচনা করেন। সদস্যরা আশা করেছিলেন এই সংবিধানটি নতুন ভারতের আশা- আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। সংবিধানটি পথ চলা শুরু করে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি।

প্রায় প্রতিটি দেশের সংবিধানের 'প্রস্তাবনা' আছে, ভারতেরও আছে। প্রস্তাবনা হলো সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থার দর্শন বা 'অন্তরাত্মা'। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশটি 'সর্বকালের উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আদর্শগুলিকে' গ্রহণ করে রচিত হয়েছে। তাই অধ্যাপক বার্কার এই প্রস্তাবনাকে 'Testament of his old age' বলে অভিহিত করেছেন।

আমাদের এই সংবিধানের প্রস্তাবনার অংশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ''আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র হিসাবে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি...''। যদিও প্রস্তাবনার জন্মলগ্নে 'সমাজতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ দুটি ছিল না। কার প্রয়োজনে এবং কীসের জন্য জানি না ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ওই শব্দ দুটির অনুপ্রবেশ ঘটানো হলো সংবিধানে।

মনে রাখা প্রয়োজন, 'প্রস্তাবনা' সংবিধানে 'অন্তরাত্মা' হলেও কিন্তু আইন নয়। এটি শুধুমাত্র সংবিধানের যে সব অংশ অস্পষ্ট তা ব্যাখ্যায় সাহায্য করে। কেউ কেউ এই অংশকে 'নিষ্ঠাপূর্ণ সংকল্প' বলে অভিহিত করেছেন। মনে রাখতে হবে, 'সংকল্প' আর আইন এক নয়। অথচ দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় 'ধর্ম নিরপেক্ষ' শব্দটি এতো ভীষণ বিকৃতভাবে আলোচিত হচ্ছে যে যাঁরা ভারতভাগকে মেনে নিতে না পেরে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন সেই 'আমরা ভারতের জনগণ' লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানের সেই বিধ্বংসী স্লোগান আজ আবার নতুন করে শুনতে পাচ্ছি। ভারতীয় আইন সভার উভয় কক্ষে সসম্মানে সিএবি পাশ হয়ে সিএএ হলে তার বিরুদ্ধে যেভাবে ক্ষোভ বিক্ষোভ, বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে এবং তার পরিণামে যে ধ্বংসলীলা, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে এমনকী গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত দু'একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যাদের নেতৃত্ব দিয়ে পথে নেমেছেন, প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন তাতে কি মনে হবে 'আমরা ভারতের জনগণ' সঠিক দিশায় গণতান্ত্রিক ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে 'সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে' কার্যকরী ভূমিকা পালন করছি? যদি আজ রাজ্য আইনসভায় পাশ হওয়া কোনো আইনের বিরুদ্ধে কেউ পথে নামে তা কি বাস্তবসম্মত হবে? আর তাছাড়া দেশে ও রাজ্যের আইন সভাগুলির কোনো প্রয়োজনীয়তা আর কি থাকবে? কেউ কেউ আবার প্রমাণ করতে অতি সক্রিয় হয়ে

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ১৯৫২ সালে বলেছিলেন— ''যেসব ছিন্নমূল মানুষ ভারতে বসবাসের জন্য এসেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই নাগরিকত্ব থাকবে। এ ব্যাপারে আইন যদি যথেষ্ট না হয় তাহলে আইন পরিবর্তন করতে হবে।'' মোদীজী সেই কাজটা করলে কংগ্রেস ও অন্যান্য বিজেপি বিরোধী দলগুলো কেন অকারণ সিএএ-ও মোদী সরকারের বিরোধিতা করছেন?

উঠেছেন ভারতের পার্লামেন্ট 'শুয়োরের আখড়া'--- এরা কি সত্যি 'ভারতের জনগণ'?

'আমরা ভারতের জনগণ' আজ দিশাহারা, সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন। কারণ সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকদের যে সব মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হলো ভারতরাষ্ট্র ধর্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। নাগরিকগণ নিজ নিজ ধর্মমত পালন করবে। ভারতরাষ্ট্র সমস্ত রকম ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও কাজকর্ম থেকে সম্পর্কহীন থাকবে, এ প্রসঙ্গে বেঙ্কটরমন বলেন— 'The state is neither religious, nor irreligious, nor anti religious, but it is wholly detached from religious dogma and activities and thus neutral in religious matters.' যদি তাই হয় তা হলে সংবিধান কার্যকর হওয়ার এতোদিন পরেও কেন ধর্মের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন হবে? কেউ কেউ দশটা বিয়ে করলেও কোনো অপরাধ বিবেচিত হতো না (তালাক প্রথা রোধ আইন ২০১৯-এর আগে পর্যন্ত) অথচ কেউ দুটি বিয়ে করলেই তাকে শ্রীঘরে যেতে হয়।

ভারতে পক্ষপাত দুষ্ট রাজনীতির কারবারিরা কোনো মন্দিরে দীর্ঘদিনের সংস্কার— ঋতুমতী মেয়েদের মন্দিরে প্রবেশ করা যাবে না'র বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপাসনা গৃহে কেন মহিলারা প্রবেশ করতে পারবে না— তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে না। আন্দোলন করে না। ভারতের রাজনীতিতে সব থেকে বেশি চর্চিত (তাদের ভারতের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে) ও বিকৃত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সিপিআই(এম) তাদের পূর্বতন রাজ্য পরিবহণমন্ত্রী একদা তাঁর তারাপীঠে পূজা দেওয়া নিয়ে ভীষণভাবে সমলোচিত হলেও ওই দলের অনেকেই মসজিদে নামাজ পড়লে বা হজে গেলে অথবা মাথায় ফেজ টুপি পরে তাঁদের উপাসনা গৃহে গেলে দোষের হয় না। যত দোষ হিন্দুরা কিছু করলেই। এ কেমন ধর্মনিরপেক্ষতা?

ফিরে আসি সিএএ-এর প্রসঙ্গে। সিএএ একটা আইন। গণতান্ত্রিক দেশে একটা রাজনৈতিক দল যখন নির্বাচনের লড়ে তখন নির্বাচনের আগে জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করা সংশ্লিষ্ট দলটির নৈতিক দায়িত্ব। বিজেপি সেই দায়িত্বই পালন করেছে। গণতান্ত্রিক দেশে সরকারের যে কোনো আইন বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন চলতেই পারে। তাই বলে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে রাজপথে (১১.০১.২০২০, কলকাতা) চলতে দেবো না, রাস্তা দখল করে রাখবো, সারা দিন-রাত শহরকে স্তব্ধ করে রাখবো, হাজার হাজার মানুষের মৌলিক অধিকার (স্বাধীনভাবে যাতায়াত ১৯ (১) (ই) ধারা)-কে খর্ব করবো, আন্দোলনের নামে দেশের জাতীয় পতাকার পাশাপাশি যে পতাকা দেশভাগের প্রতীক সেই কালো পতাকাকে সমান মর্যাদায় তুলে ধরবো— এসব যারা বলেন বা করেন তারা কোন 'ভারতের জনগণ'? প্রশ্ন তো উঠতেই পারে, যেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনভাবে যাতায়াত করতে পারেন না, সেখানে একজন সাধারণ মানুষ বা বিরোধী পক্ষের কোনো ছোটো বড়ো নেতা বা কর্মী কীভাবে চলাফেরা করবেন? কেন সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে গণতন্ত্র বিপন্ন বা সাংবিধানিক সংকট ঘোষিত হবে না?

সিএএ বা 'সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ২০১৯' নিয়ে কংগ্রেস বা কংগ্রেসজাত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা বামপন্থীরা বিরোধিতা করছেন, অথচ অদূর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে ১৯৭২ সালে ইন্দিরা গান্ধী উগান্ডার ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের, ১৯৬৪-২০০৮ সাল পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা থেকে আগত ৪.৬১ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিলদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার নাগরিকত্ব প্রদান করেছে। তাতে দোষের কিছু নেই, যত দোষ মোদী সরকারের।

প্রশ্ন হলো, মোদী সরকার কেন সিএএ ২০১৯ করতে বাধ্য হলো? উত্তরে যাবার আগে একটা কথা স্বীকার করে নিতে হবে মোদী বাল্যতকাল থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন সক্রিয় স্বয়ংসেবক। ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আলোকে তিনি প্রজ্বলিত, দ্বিজাতিতত্ত্বের (হিন্দু-মুসলমান) ভিত্তিতে ভারত ভাগে তিনি ব্যথিত। আর যেন ওই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য তিনি ভাবিত। তিনি আবার বিবেকানন্দের শিষ্য। বিবেকানন্দের ভাষায়— ''যদি হিন্দু জাতি জীবিত থাকিতে চায়, তবে এই ধর্মকে তাহার জাতীয় মেরুদণ্ড স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে।''

এই ভাবনার সঙ্গে তিনিও সহমত। আবার তিনি দায়িত্বশীল রাষ্ট্রনায়ক, নির্বাচনের আগে দলীয় ইস্তেহার অনুযায়ী জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করতে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' তাঁর স্বপ্ন। রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শগুলিকে তুলে ধরতে সক্রিয় হয়েছেন। যেমন— স্বচ্ছ ভারত, রামরাজ্য কেন্দ্রিক গ্রাম ভারত। গান্ধীজী ২৬.০৯.১৯৪৭-এ এক প্রার্থনা সভায় বলেছিলেন— ''পাকিস্তানে (অখণ্ড পাকিস্তান) বসবাসকারী হিন্দু ও শিখ অবাধে ভারতে আসতে পারেন, যদি তাঁরা ওদেশে বসবাস করতে না চান। সেই পরিস্থিতিতে তাঁদের চাকরির ব্যবস্থা করা এবং জীবনকে বাসযোগ্য করে তোলা ভারত সরকারের কর্তব্য'' আর পূর্বতন সরকারগুলোর অবহেলিত 'কর্তব্য' সম্পাদন করতে হলো মোদীজীকে। স্বাধীন ভারতে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ১৯৫২ সালে বলেছিলেন— ''যেসব ছিন্নমূল মানুষ ভারতে বসবাসের জন্য এসেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই নাগরিকত্ব থাকবে। এ ব্যাপারে আইন যদি যথেষ্ট না হয় তাহলে আইন পরিবর্তন করতে হবে।'' মোদীজী সেই কাজটা করলে কংগ্রেস ও অন্যান্য বিজেপি বিরোধী দলগুলো কেন অকারণ সিএএ-ও মোদী সরকারের বিরোধিতা করছেন? আন্দোলন চালাতে গিয়ে অগণতান্ত্রিক ভাবনার জন্ম দিচ্ছেন ও রাষ্ট্রের সম্পত্তি ধ্বংস করছেন কেন বোঝা যায় না। এর পরেও কী তাঁদের শ্রীমুখে মানায়— ''আমরা ভারতের জনগণ... সাধারণতন্ত্র হিসেবে গড়ে তুলতে সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি,...''। ■

শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের ট্রাস্ট গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি সংসদে শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই ট্রাস্ট গঠনের কথা ঘোষণা করার জন্য মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। শ্রী শাহ বলেছেন, আজ সমগ্র দেশের কাছে এই দিনটি অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের। তিনি আরও বলেছেন, 'ভারতের আস্থা ও অটল বিশ্বাসের প্রতীক ভগবান শ্রীরামের মন্দির নির্মাণে তাঁর অঙ্গীকারের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানাই'।

শ্রীরাম জন্মভূমি সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র নামে একটি ট্রাস্ট গঠনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ঘোষণা অযোধ্যায় ভগবান শ্রীরামের মন্দির নির্মাণের লক্ষ্যে সরকারের অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে। শ্রী শাহ আরও বলেন, শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টে ১৫টি ট্রাস্টি

থাকবে। এর মধ্যে একটি ট্রাস্ট গঠিত হবে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষজনদের মধ্যে। শ্রী শাহ বলেন, 'সামাজিক সম্প্রীতি আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে এ ধরনের একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাই'। মন্দির সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ অধিকার এই ট্রাস্টের থাকবে বলে জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, '৬৭ একর জমি ট্রাস্টকে হস্তান্তরিত করা হবে।' আমি আশাবাদী যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাঁরা কয়েক শতাব্দী ধরে অপেক্ষা করে আসছেন, তাঁরা শীঘ্রই শ্রীরামের জন্মভূমিতে মন্দির দেখতে পাবেন' বলে শ্রী শাহ অভিমত প্রকাশ করেন।

কৃষকদের জন্য ভারতীয় রেলের 'কিষান রেল' উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'-এর স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে ২০২০-২১ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেটে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২২

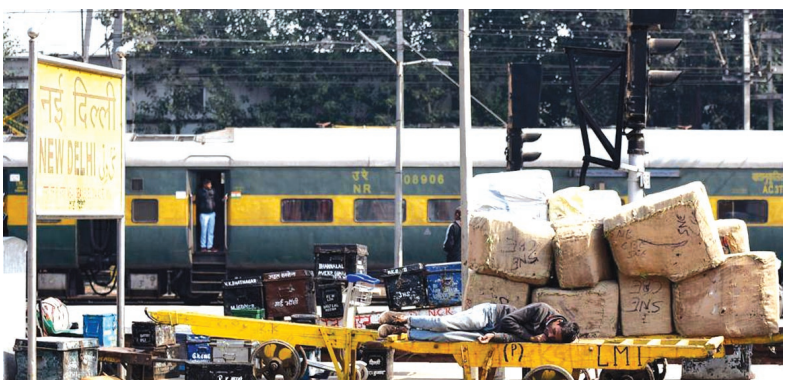

সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে বদ্ধপরিকর। কৃষিজাত পণ্য কেনা, পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাত করতে কৃষকরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। এই সমস্যা দূরীকরণে মাংস, মাছ, দুধের মতো পচনশীল সামগ্রীকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনায় নির্বিঘ্নে পরিবহণের জন্য সরকারি- বেসরকারি উদ্যোগে 'কিষান রেল' চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবারের বাজেটে। বাজেটের এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভারতীয় রেল পচনশীল সামগ্রী নির্বিঘ্নে পরিবহণের জন্য একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। কাপুরথালা রেল কোচ ফ্যাক্টরিতে নতুন নির্মিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পার্সেল ভ্যান তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় রেলে এ ধরনের ৯টি পার্সেল ভ্যান রয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত সবজি এবং ফলমূল সরবরাহের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কনকরের মাধ্যমে ৯৮টি বায়ু চলাচলে সক্ষম ইনসুলেটেড কনটেনার সংগ্রহ করা হয়েছে। কিসান ভিসন প্রকল্পের আওতায় পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরঘাট, দিল্লির আদর্শ নগরে নতুন আজাদপুর এবং উত্তরপ্রদেশের রাজ কা তালাব-এ পচনশীল সামগ্রী নির্বিঘ্নে সংরক্ষণের জন্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম কার্গো সেন্টার খোলা হয়েছে। দাদরি হিমঘর ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঘটানো হয়েছে।

২০১৯-এ স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, আগামী ৫ বছরে ১০০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এরই অঙ্গ হিসেবে ২০১৯-এর ৩১ ডিসেম্বর জাতীয় পরিকাঠামো পাইপলাইনের সূচনা করা হয়। এর পাশাপাশি রেল স্টেশনের আধুনিকীকরণ, মেট্রো এবং রেল পথে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি, পণ্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য গুদামঘর নির্মাণ-সহ একাধিক নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

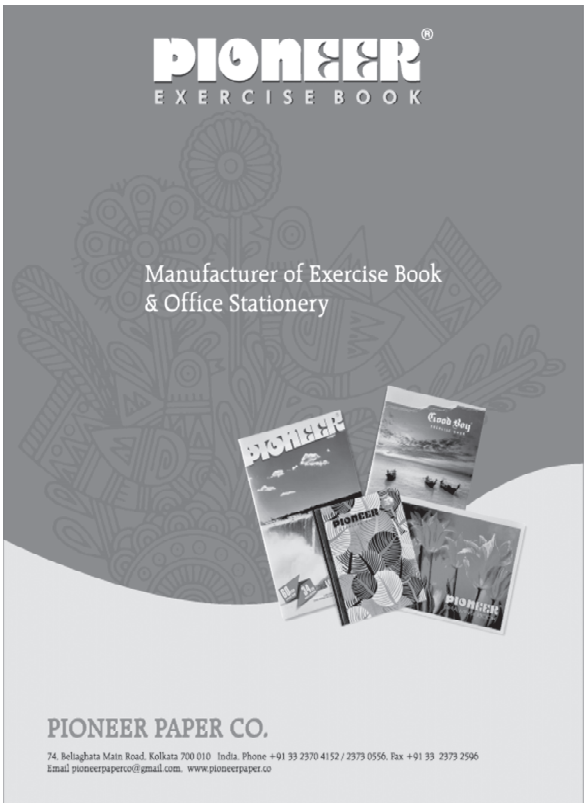

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

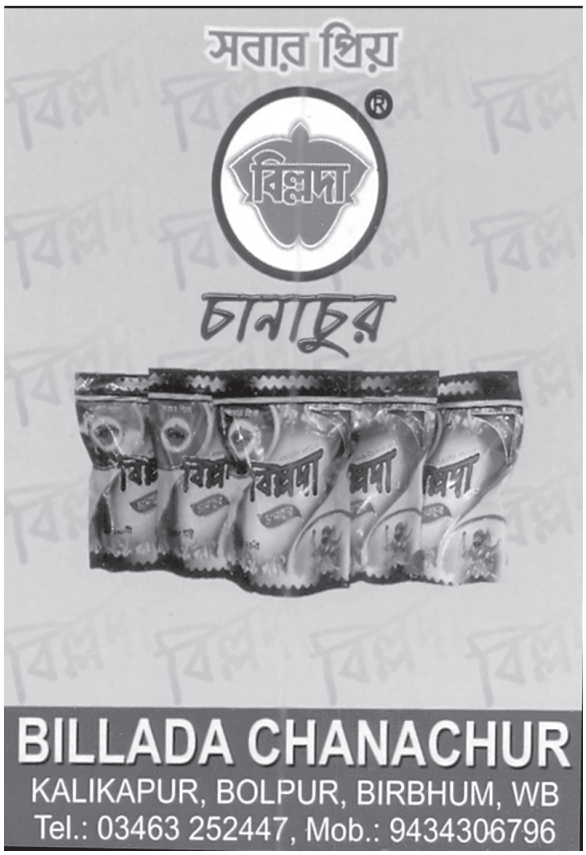

কুষ্ঠ নিবারণের জন্য আন্তর্জাতিক গান্ধী পুরস্কার প্রদান রাষ্ট্রপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ কুষ্ঠ নিবারণের জন্য আন্তর্জাতিক গান্ধী পুরস্কার প্রদান করলেন ভারতীয় মনোনয়ন (ব্যক্তি) বিভাগে ড. এন এস ধর্মশক্তু এবং প্রতিষ্ঠান বিভাগে লেপ্রসি মিশনকে। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, কুষ্ঠের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ে আমরা বিগত বছরগুলিতে অনেকটাই সাফল্য লাভ করেছি। প্রতি ১০ হাজার মানুষের মধ্যে একজনের কম কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত এই মাপকাঠিতে আমরা কুষ্ঠ দূরীকরণে সাফল্য লাভ করেছি। এছাড়া, কুষ্ঠ নিয়ে যে কুসংস্কার এবং ভুল ধারণা চালু রয়েছে তা অনেকটাই কমানো গেছে। এর জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য বিজ্ঞানী, গবেষক, প্রতিষ্ঠান এবং সমাজকর্মীদের। তবে, আমাদের অসতর্ক হলে চলবে না। এখনও নতুন করে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটছে এবং কোনো কোনো জায়গায় এখনও এর প্রকোপ বেশি।

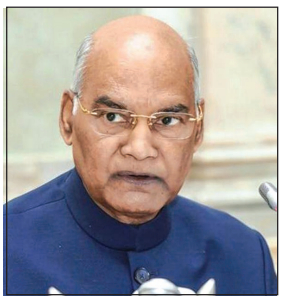

রাষ্ট্রপতি বলেন, কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণে প্রধান সমস্যা সব জায়গায় একই পরিমাণে নজর দেওয়ার অভাব, বিশেষ করে দারিদ্র্য পীড়িত অঞ্চলে যেখানে মানুষ কম চিকিৎসার সুবিধা পান। আমাদের প্রয়োজন দ্রুত রোগ নির্ণয় করতে সচেষ্ট হওয়া, উপযুক্ত চিকিৎসা দেওয়া এবং ভৌগোলিকভাবে যেখানে এর প্রকোপ বেশি, সেখানে নিবিড় পরিষেবার ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্রপতি বলেন, শুধু শারীরিক পরিস্থিতিই নয়, এই ব্যাধির সঙ্গে যে সামাজিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জড়িয়ে আছে তা এখনও উদ্বেগের।

আমাদের সচেতন হতে হবে এবং এই ব্যাধি সম্পর্কে শিক্ষিত হতে হবে। এর নানা দিক সম্বন্ধে জানতে হবে এবং এই ব্যাধি সম্পর্কে শিক্ষিত হতে হবে। এর নানা দিক সম্বন্ধে জানতে হবে এবং আমাদের সমাজে সচেতনতার প্রসার ঘটাতে হবে। বৈষম্যের শিকার কুষ্ঠ রোগীদের ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। এর জন্য সার্বিক প্রচারের প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিবের করোনা ভাইরাসজনিত পরিস্থিতির পর্যালোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ সচিব শ্রীমতী প্রীতি সুদান নোবেল করোনা ভাইরাসজনিত পরিস্থিতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেন। তিনি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি, এই ভাইরাসজনিত অসুখ ছড়িয়ে পড়া রুখতে প্রস্তুতিও খতিয়ে দেখেন। নির্দিষ্ট বিমানবন্দরগুলিতে সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড থেকে আসা সমস্ত বিমানযাত্রীদের পাশাপাশি, হংকং ও চীন থেকে আসা বিমানগুলির যাত্রীদেরও স্বাস্থ্য পরীক্ষ করা হচ্ছে। বর্তমানে ২১টি বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর এবং স্থলবন্দরগুলিতে যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলছে। এছাড়াও, এখনও পর্যন্ত ১,৬০০-ও বেশি বিমানের ১ লক্ষ ৭৬ হাজারের বেশি যাত্রীর স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সবরকম সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মী ও আধিকারিকদের নিয়মিতভাবে এই ভাইরাস সম্পর্কে আরও বেশি তথ্যাভিজ্ঞ করে তোলা হচ্ছে। গ্রামসভাগুলিতেও এই ভাইরাসের বিভিন্ন লক্ষণ, প্রতিকার প্রভৃতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলতে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ৩২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ৭,৯৯৪টি নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। তিনটি বাদে বাকি সমস্ত নমুনায় ভাইরাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়নি। যে তিনটি নমুনায় ভাইরাসের উপস্থিতি মিলেছে, সেগুলি কেরল থেকে।

‘এক দেশ, এক রেশন কার্ড’ ব্যবস্থার রূপায়ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গণবণ্টন ব্যবস্থায় সংস্কারের অঙ্গ হিসেবে ২০১৮-র এপ্রিল থেকে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে গণবণ্টন ব্যবস্থার সুসংবদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো—২০১৩-র জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় রেশন কার্ডধারীদের জন্য দেশের যে কোনও জায়গা থেকে রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করার ব্যবস্থা চালু করা। এই ব্যবস্থার নামই হলো ‘এক দেশ, এক রেশন কার্ড’। লোকসভায় এক লিখিত জবাবে একথা জানান কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গণবণ্টন প্রতিমন্ত্রী দানভে রাওসাহেব দাদারাও।

তিনি আরও বলেন, রেশন কার্ডধারীরা দেশের যে কোনও জায়গায় ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলি থেকে রেশন সংগ্রহ করতে পারবেন, তবে, সংশ্লিষ্ট রেশন কার্ডধারীকে তাঁর রেশন কার্ডের সঙ্গে বায়োমেট্রিক বা আধার যুক্ত করতে হবে। এই লক্ষ্যে অধিকাংশ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।

‘এক দেশ, এক রেশন কার্ড’ কর্মসূচির আওতায় কার্ডধারীদের প্রাপ্য খাদ্যশস্য বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ওপর অতিরিক্ত বোঝা পড়বে না। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এ বিষয়ে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে অবগত করা হয়েছে। এমনকী, এক রাজ্যের রেশন কার্ডধারী যে পরিমাণে রেশন পেতেন, সেই ব্যক্তি অন্য রাজ্যে গেলেই সমপরিমাণ রেশন পাবেন।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

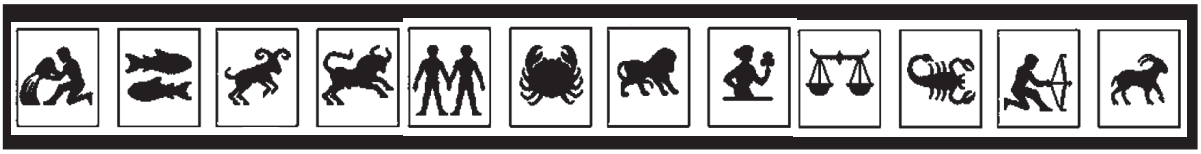

১৭ ফেব্রুয়ারি, (সোমবার) থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) ২০২০। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, ধনুতে মঙ্গল, বৃহস্পতি, কেতু, মকরে শনি, কুম্ভে রবি, বুধ, মীনে শুক্র। ১৮-০২ মঙ্গলবার, বুধ বক্রীরূপে পরিগ্রহ করছে। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র বৃশ্চিকে অনুরাধা নক্ষত্র থেকে কুম্ভে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে।

মেষ : ছিদ্রান্বেষী ঈর্ষাকাতর মিত্র ও সহকর্মীদের সৌজন্যহীনতায় মানসিক অস্থিরতা। মাতার কষ্ট। গুরুজনে অবহেলা, নিষিদ্ধ দ্রব্যে আসক্তি। ব্যয় বাহুল্যে ঋণ বৃদ্ধি, কর্মে অস্থিরতা। জীবন সঙ্গীর কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন, মর্মবেদনার অবসানে নব প্রেরণা লাভ।

বৃষ : উদ্যোগী ও প্রত্যয়ী মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সহায়ক। বিশিষ্ট ব্যক্তির সান্নিধ্যে সন্তান-সন্ততির প্রতিভার ব্যাপ্তি, নতুন চিন্তাভাবনার উদ্ভাবন, সৃজনশীল প্রতিভার স্ফুরণ। জীবনসঙ্গীর বৈষয়িক উন্নতি, একাধিক পন্থায় রোজগারের সুলুক সন্ধান, কর্মসূত্রে প্রবাস। বিবাহযোগ্য প্রার্থীর আড়ম্বরের সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হবে। বিনিয়োগে বিলম্বে প্রাপ্তি।

মিথুন : ব্যবসায় বিনিয়োগ ও নতুন উদ্যোগে গুরুজনের পরামর্শ শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মতান্তর, বুদ্ধিমত্তায় মোকাবিলা করুন। পিতার শারীরিক অবস্থার অবনতি এবং সন্তানের চঞ্চল ও বেপরোয়া মনোভাবে উদ্বেগ। ভ্রাতা-ভগ্নীর সহযোগিতায় হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার। আর্থিক স্থিতি শুভ হলেও ব্যয়াধিক্যে সঞ্চয়ে হাত পড়ার সম্ভাবনা। উত্তেজনাকর পরিবেশ ও যুবক বন্ধু এড়িয়ে চলুন।

কর্কট : গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, পুত্রের প্রতিষ্ঠা, মাতৃসুখ, তবে আইনি জটিলতা। কথাবার্তায় সংযম প্রয়োজন। পারিপার্শ্বিক কারণে উদ্বেগ-অশান্তি। বিদ্যার্থীর গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। অনুজের দুরূহ কাজে সফলতা। পরিবারে নবাগতের আগমনের সম্ভাবনা।

সিংহ : অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, কর্মনিপুণতা, বুদ্ধিমত্তা, শারীরিক পটুতায় পেশাগত জীবনে আধিপত্য, সাফল্যের সোপানে ক্রমোন্নতি ও আর্থিক প্রতিপত্তি লাভ। সন্তানের মেধার ঔজ্জ্বল্যে ফুল্লকুসমিত সময়। দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি, পুরানো প্রেমের পুনরাবৃত্তি, শরীরের নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

কন্যা : জীবনসঙ্গীর বিনয়, নম্রতা, সরলতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় পরিস্থিতির সম্যক উপলব্ধি। লোকসমাজে সমাদর পদোন্নতি, নিজ ব্যক্তিত্বে ফ্যাশনেবল ব্যবসায় খ্যাতি ও পরিবারে সমৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত। শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনে উদ্যম, অধ্যাবসায় ও নিষ্ঠা প্রয়োজন। সন্তানের আধুনিক মনস্কতা ও বেপরোয়া আচরণ পারিবারিক সুস্থিতি বিনষ্টের কারণ।

তুলা : জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা, পরার্থপরতায় দীপ্ত পদচারণা ও আভিজাত্য গৌরব। ভ্রাতা-ভগ্নীর আত্মপ্রতিষ্ঠার ফলবতী চেষ্টা। গৃহ ও ভূমিলাভ। গুরুজন ও দেব-দ্বিজে ভক্তি, আপোশহীন সংগ্রামী মানসিকতায় পার্থিব জীবনে যশ। চক্রান্তকারীর অপচেষ্টা। সপ্তাহের প্রান্তভাগে মাতার স্বাস্থ্যাবনতি ও গৃহসুখ বিনষ্ট।

বৃশ্চিক : জাতকের কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি প্রাপ্তির ভাণ্ডার আশাব্যঞ্জক। সৎকর্মে মনোনিবেশ, সুধীজন সমাবেশে ভাষণে পাণ্ডিত্য প্রভাবে খ্যাতি। অভিনেতা, ফ্যাশন ডিজাইনার চিত্র, ভাস্কর্য ও নৃত্যশিল্পীদের সৃজনশীলতা, আনুষ্ঠানিক ব্যস্ততা ও প্রতিষ্ঠা। দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায় প্রেমিকাদের পত্নীরূপের সার্থক প্রকাশ। প্রতিবেশীর প্ররোচনায় ভ্রাতৃবিরোধ কৌশলে প্রতিহত করুন।

ধনু : জীবনসঙ্গীর ঈর্ষা, ক্রোধের বহ্নিতে অর্ধসমাপ্ত কর্ম, নিরাপত্তায় সতত সজাগ থাকুন। প্রিয়জন বিরোধ, অবাধ্য সন্তান, আর্থিক শ্লথ গতি কৃষি ও গৃহপালিতের ক্ষতির কারণে দুর্বল মন। সপ্তাহের শেষভাগে মিত্রের সহযোগিতায় কৃষ্ণনিবিড় দিনের অবসানে ভাগ্যাকাশে উজ্জ্বল আলোক প্রভা। হৃদযন্ত্র, চোখ ও রমণীর প্রতি দুর্বলতায় সতর্কতা প্রয়োজন।

মকর : অপ্রত্যাশিত ব্যয় বাহুল্য, মিত্র চক্রান্তে আইনি জটিলতা। কর্মসংস্থান নীতিবিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সমঝোতায় বেদনা ও সন্তাপ। অগ্রজের প্রতিষ্ঠা ও পারিবারিক কর্তব্যে সচেতনতা বৃদ্ধি। আর্থিক প্রতিকূলতায় সংযত আচরণের পরিবর্তে পাওয়ার তীব্রতায় বিধিবহির্ভূত পথে গমন ও অসুস্থতা। নারী জাতিকাদের গর্ভাশয়ের সমস্যায় সতর্কতা দরকার।

কুম্ভ : আয়ের মন্থর গতি, জমা অর্থে হাত পড়ার সম্ভাবনা। আপোশহীন দৃঢ় মানসিকতায় কর্মক্ষেত্রে একাধিক সুযোগ। কর্মপ্রার্থীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে ভাগ্যোদয়ের প্রশস্ত পথ। পারিবারিক শান্তি বজায় রাখতে ধৈর্য্য ও সংযম দরকার। স্বর্ণ-অলংকার, কসমেটিক্স, বস্ত্র ব্যবসায় নতুন উদ্যোগে সাফল্য। ব্যাঙ্ক লোন প্রাপ্তি, বাকসংযম ও বয়স্ক মহিলার সংস্রব বর্জনীয়।

মীন : বিভিন্ন কাজের চাপ ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনে অবৈধ পথে উপার্জনার্থে অসৎ সংসর্গের হাতছানি পরিহার করুন। গৃহসজ্জা, অলংকার, বাহন ক্রয়ে ব্যয়াধিক্য যোগ। কর্মের যোগসূত্রে বিবাহবন্ধনের যোগ ও ভ্রমণ। রমণীর স্নেহসুধায় ভাবান্তর। পুরানো প্রেমের সম্পর্কের অনুরণনে ভালোবাসার স্মৃতি মন্থন।

• জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।

—শ্রী আচার্য্য